

আজকাল প্রকাশন ■ ১৫ নভেম্বর ২০০৪ ■ ৮ টাকা
খেলা
ম্যান অফ দ্য সিরিজ ড্যামিয়েন মার্টিন
টেস্ট জয়ে অবদান হরভজনেরও
একদিনের ম্যাচে কেন বাদ মুরলি কার্তিক ?
ষষ্ঠী, দীপঙ্কর কীভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলেন ?
ডুরান্ড কাপ
টেস্ট সিরিজ ❑ ময়নাতদন্ত



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

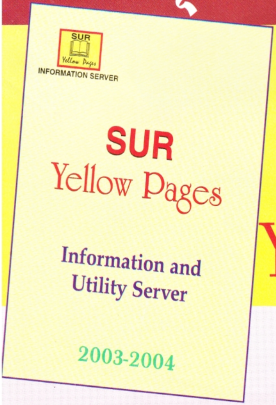
এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন ।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

এবার পূজোয় নতুন উপহার



SUR
Yellow Pages



Information and Utility Server

To book your advertisement for next edition

SUR INFODATA MEDIA CO.

SUR Yellow Pages INFORMATION SERVER

11. B. T. Road, Kol-56, Ph. : 2544-1499, 30910097
Website : www.suryellowpages.com

SUNANDA AD

খেলা

১৫ নভেম্বর ২০০৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৭
আজকাল
প্রকাশন



ডুরান্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল

২৬ মুনাল চট্টোপাধ্যায়



সুভাষ ভৌমিকের সাক্ষাৎকার ৩৮-৪০

সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

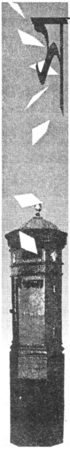
সহযোগী সম্পাদক : সুরজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : দেবব্রত ঘোষ
অলঙ্করণ : দেবাশিস রায়
ছবি : বিকাশ সাধু, শান্তি সেন, শঙ্কর নাগদাস ও রনি রায়

দাম : ৮ টাকা

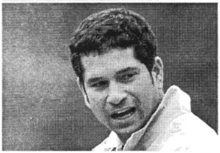
বিমান মাসুল : ত্রিপুরায় ২০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র ২৫ পয়সা
আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে জ্যোতিপ্রকাশ খান কর্তৃক প্রকাশিত এবং আজকাল প্রেস, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত
ফোন: ২৩৫০-৯৮০৩ ❑ ফ্যাক্স: ২৩৫০-০৮৭৭

নিয়মিত বিভাগ



সম্পাদকের কাছে

ফুটবলপ্রেমীরা মেনে নেবো না



একটি মোবাইল টেলিফোন সংস্থা (বেসরকারি) বিজ্ঞাপনে ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকারকে ব্যবহার করেছে। করতেই পারে। কারণ শচীনের বাণিজ্যমূল্য (নাকি) অপরিসীম। কিন্তু আপত্তি বিজ্ঞাপনের কথন ও ভঙ্গিমায়। শচীন হাতে ও পায়ে ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে। গোটা শরীর কাদামাখা। টেলিফোন সংস্থার কর্তারা কি চাইছেন? শচীনের জনপ্রিয়তা না ফুটবলের জনপ্রিয়তা? শচীনকে ফুটবলার সাজিয়ে পণ্য বেচার উদ্দেশ্য কি? ফুটবলকে কি অপমান করা নয়। আমাদের দেশে কি ফুটবলারের অভাব? বাইচুং ভুটিয়ার কথা কেন ভাব হল না? যদি ক্রিকেটারকে ক্যাশ করতে চায় তো ক্রিকেটার হিসেবে উপস্থিত করা হোক। আর ফুটবলকে ক্যাশ করতে চাইলে ফুটবলাররাই আসুক বিজ্ঞাপনে। ফুটবলারদের অবহেলা করার অধিকার কারও নেই। আমরা ফুটবলপ্রেমীরা মেনে নেবো না।

সোমনাথ পাল। *রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া*

বাংলার ফুটবলাররা ব্রাত্য হয়ে উঠছে কেন?

সম্প্রতিকালে কলকাতায় ফুটবল দলগুলিতে ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের ভিড় বেড়েই চলেছে। বিদেশি ফুটবলাররা স্রোতের বেগে এ রাজ্যে ঢুকছে। কলকাতার নামীদামি ফুটবল ক্লাবগুলির খেলোয়াড় তালিকায় চোখ রাখলে সত্যটা দিনের আলোর মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। চিমা, জামসিদ, মজিদ, শ্যাম, ব্যারেটোরা তাঁদের অনবদ্য ফুটবল শৈলীতে গৌরবান্বিত করে গেছেন ফুটবলের মক্কা কলকাতার ফুটবল মানকে। বিভিন্ন সময়ে অন্য রাজ্য থেকে অনেক ফুটবলার কলকাতায় খেলে পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা, অর্জন করেছেন বহুল জনপ্রিয়তা। ক্ষেত্র বিশেষে অন্য রাজ্যের ফুটবলাররা বাংলার ফুটবলকে উৎকর্ষতা প্রদান করলেও বাংলার অসংখ্য ফুটবল তারকার দাপটে এক সময় ঢাকা পড়ে যেত বিদেশিদের কৃতিত্ব। গৌতম, প্রসূন, বিদেশ, মানস, সুরজিৎ, সমরেশ, কৃশানু, বিকাশ, সুধীর, সুব্রত, মনোরঞ্জনরা বাংলার ফুটবলকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় ফুটবল দল এ সময়ে বৃহত্তর সাফল্য না পেলেও জাতীয় স্তরে বাংলার ফুটবল মান ছিল অগ্রগণ্য। অনেকবারই সন্তোষ ট্রফি এসেছে বাংলার ঘরে। শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ডসহ সমস্ত প্রতিযোগিতায় বাংলার ক্লাবদলগুলির প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ ও সংশয়াতীত। এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল খোদ বাঙালি ফুটবলারদের অনেক ঘাম-রক্ত ঝরানো পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। শক্তি আর শিল্পের নিখুঁত সমন্বয়ে আলোকিত হয়েছিল বাংলার ফুটবল। সখেদে বলতেই হচ্ছে একবিংশ শতকের বিশ্বায়নের মুক্ত বাতাস লেগেছে বাংলার ফুটবলে। সুদূর নাইজেরিয়া বা লাতিন আমেরিকা থেকে ফুটবলাররা বাংলায় খেলতে এসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছেন। কর্মকর্তারা ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে অন্য রাজ্যের ফুটবলারদের পিছনে ঘুর ঘুর করছেন। তাহলে কি বাংলার ফুটবলাররা তাদের কাছে 'ব্রাত্য' হয়ে উঠেছে? নাকি বাংলার ফুটবলারদের দক্ষতা এবং যোগ্যতার অভাব দেখা দিচ্ছে? বিদেশিদের নিয়ে আমরা গর্ব করছি কিন্তু বাংলার নিজস্ব ঘরানার ফুটবল শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার। ভাল ফুটবলার তৈরির পরিকাঠামো কি তাহলে বাংলায় নেই? ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সকলের উচিত বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনার।

অরূপ মণ্ডল। *প্রফুল্ল নিকেতন শরৎপল্লী, গোলাপবাগ উত্তর, পোঃ রাজবাটী, বর্ধমান: ৭১৩১০৪*

মাদার অফ উইম্বলডন



মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, বর্তমান বয়স ৪৮ বৎসর— টেনিসের কিংবদন্তি নারী চরিত্র। দশ বছর পর উইম্বলডনে সিঙ্গলস খেলতে এসে দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ঘোষণা করলেন আর কখনও উইম্বলডনে খেলতে আসবেন না। ছোটবেলায় একটা দোকানে বাবার সঙ্গে গিয়ে দোকানের দীর্ঘ আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, অনেকটা ছেলেদের মতো দেখতে বলে। বাবা মিরোস্লাভ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ছেলেদের মতো না হলে, ছেলেদের মতো স্ট্যামিনা, শক্তি না থাকলে তুমি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হবে কি করে? সেদিন থেকে প্রিয় খেলা আইস হকি ছেড়ে টেনিস নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলেন। মার্টিনার জন্ম ১৯৫৬ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে। সেখানে নানান পারিবারিক অসুবিধার জন্য আমেরিকায় চলে যান এবং সে দেশের নাগরিকত্ব নেন। মেয়েদের টেনিসে প্রথম পাওয়ার টেনিসের প্রচলন ঘটান তিনি। প্রথম ডাবলস খেতাব জেতেন ১৯৭৬ সালে। প্রথম বিশ্বক্রমপর্যায়ে এক নম্বর হন ১৯৭৮ সালে। গ্রান্ডস্লাম সিঙ্গলস টুর্নামেন্ট জয় ১৮টি। উইম্বলডন জয় ৯ বার। তার মধ্যে টানা জয় ৬ বার (৮৩-৮৭), যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতেন ৪ বার, ফরাসি ওপেন ২ বার এবং অস্ট্রেলিয়া ওপেন জিতেছেন ৩ বার। পাম শ্রিভারকে সঙ্গী করে ডাবলসে ১০৯টি জয়ের বিশ্বরেকর্ড আজও অম্লান। হল অব ফেম হন ২০০০ সালে। মার্টিনাই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি চেকোস্লোভাকিয়া এবং আমেরিকা দু-দেশের হয়েই ফেডারেশন কাপ জেতেন। জীবনে ১৪৩৮টি সিঙ্গলস খেতাব জেতেন। জীবনে ১০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রাইজমানি পেয়েছেন। মার্টিনার সঙ্গে উইম্বলডনের যেন নাড়ির টান। উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টের ঘাস নিজের গয়নার বাক্সে সযত্নে রেখে দিয়েছেন মার্টিনা। তাঁকে বলা হয় মাদার অফ উইম্বলডন। ক্রিস এভার্টের ১৫৪টির রেকর্ড ভেঙে ১৬৭টি সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন তিনি। আর ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৬৫ বার। টেনিস দুনিয়ার একমাত্র কমপ্লিট খেলোয়াড় তিনি। শতাব্দীর সেরা মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে, স্বীকার করে নিয়েছেন বিখ্যাত সব টেনিস খেলোয়াড় এবং বিশেষজ্ঞরা। উইম্বলডন মার্টিনা আর না খেলার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণার ফলে উইম্বলডন হারাল তার সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণময় চরিত্রকে।

অতনু দাশগুপ্ত। *'পিয়ালিভবন', তালবাগান ব্যাঙ্ক রোড, পোঃ নোনা-চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর-৭৪৩১০২*

আই সি সি-র নির্বাচন ও রাজনীতি

সেরা চিঠি

সম্প্রতি বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট সংস্থার নির্বাচন নিয়ে নোংরাতম রাজনীতি দেখা গেল। যার জল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। সেখানে এক অভাবনীয় ব্যাপার জানা গেল। তা হল যে দেশে থাকি, মায় সেই দেশের হয়ে নাকি ক্রিকেটাররা খেলেন না। খেলেন ওই সংস্থার হয়ে। সেজন্যই তো ম্যাথু হেডেন এদের 'স্বার্থপর' বলার সাহস দেখান। যুক্তিতর্কের ধার ধারি না। প্রশ্ন একটাই এইভাবে কি জাতীয়তাবোধ হরণ করা হচ্ছে না? তেমন হলে তো তার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা হওয়া উচিত। এবার হয়ত সব সংস্থা একই কথা বলবে। এতে জাতীয়তাবাদ বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী-উদ্ভিদের তালিকায় নাম লেখাবে। সবাই স্বাধীন হয়ে যাবে। এই দেশে থাকবে, খাবে কিন্তু দেশের হয়ে 'করছি না' বলাটা সোনার পাথরবাটির মতোই শোনাবে। তবু কিছু বলা যাবে না। বর্তমানে একঝাঁক ক্রীড়া প্রশাসক নির্বাচনে জিতে সংসদে গেছেন কি এজন্যই? যদি শেষ পর্যন্ত তাই হয় তা হলে বহুদিন আগে মনসুর আলি খান পতৌদির সেই কথাটাই ফিরে আসবে— 'আমাদের জাতীয় খেলা হকি বা কবাডি নয়, আমাদের জাতীয় খেলা রাজনীতি।' সেজন্যই আমাদের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা 'ভারতীয় ক্রিকেট' না হয়ে বি সি সি আই হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধের এই বিপন্নতা কি আমরা মেনে নেব?

মৃগাঙ্কমৌলি মর্দ্দন্যা *কুলগোড়া, পুরুলিয়া-৭২৩১০১*

গঙ্গা পেরলেই হারিয়ে যায় **না**

গঙ্গা পেরলেই নাকি ইস্টবেঙ্গল পারে না। কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে মোহনবাগানিদের। এবার ডুরান্ড ফাইনালে ১০ জনের ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারার পর মোহনবাগানিরা নিশ্চয়ই আর ওরকম বালকসুলভ, অখেলোয়াড়ি উক্তি করবেন না। শুধু এবারের ডুরান্ড জয়ই নয়, অতীতের পরিসংখ্যান ঘাঁটলেও দেখা যাবে বাংলার বাইরে দু'প্রধানের সাক্ষাৎকারে বেশির ভাগ সময়ই জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এ তো মুখের কথা নয়, বা তাত্ত্বিক লড়াই নয়। বাংলার বাইরে ভারতীয় ফুটবলের 'নীল ফিতে' নামে খ্যাত ডুরান্ড এবং রোভার্স কাপে দু'প্রধানের লড়াইয়ে দেখা যাবে ইস্টবেঙ্গলই বেশির ভাগ সময় জিতেছে। ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রেও এবার



ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানকে ধরে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। তা হলে কি বোঝা যাচ্ছে গঙ্গা পেরলে ইস্টবেঙ্গল শেষ, আর মোহনবাগানের জয়জয়কার। দলে বিদেশি স্টপার চাই, গোল করার লোক চাই এমন কাঁদুনি ইস্টবেঙ্গলে নেই। যা রয়েছে মোহনবাগান কোচের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গল যে দল নিয়ে ডুরান্ড জিতল সেখান থেকেই শিক্ষা নিক মোহনবাগান। মাঝমাঠে চন্দন, দীপঙ্কর নেই। আক্রমণে নবি, বাইচুং নেই। রক্ষণে নেই দীপক। তবু এই দলই হারিয়ে দিল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক— মোহনবাগানকে। এই জয় শুধু ইস্টবেঙ্গলের নয়। গোটা বাংলারও বটে। বাংলার বাইরে একটানা ব্যর্থতার পর ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড জয় অবশ্যই বাংলার ফুটবলকে পথ দেখাবে।

অনির্বাণ সেনগুপ্ত। *আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।*

পদ্মশ্রীর জন্য প্রতীক্ষা কতদিন?

মধুমিতা সিং বিস্ত (গোস্বামী) খেলোয়াড় হিসেবে ওঁর অবদান ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। একজন মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে মধুমিতার কৃতিত্ব ভারতীয় ক্রীড়াজগতে এক ইতিহাস হয়ে আছে। টানা ২৭ বছর ব্যাডমিন্টন খেলেছেন। তার মধ্যে ২৫ বছর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনিই দেশের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ক্রীড়াবিদ যিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ১৯৭৮ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে ভারতের হয়ে চীনে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম অংশ নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। জাতীয় প্রতিযোগিতায় টানা পাঁচ বছর সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতে রেকর্ড করে রেখেছেন। এ ছাড়া ৯২ সালে বিশ্ব বাছাই তালিকায় একজন ভারতীয় হয়ে ২৯তম স্থান পেয়েছিলেন তখনকার বঙ্গললনা। ৮৬ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় বাছাই খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ার কুসুমা সারবান্দাকে হারানোও একটা বিরাট সাফল্যের নজির হয়ে আছে। আরও নজির হয়ে আছে কমনওয়েলথ-এর একটা ব্রোঞ্জ পদক। আছে সাফ গেমসের পাঁচটা সোনা ও তিনটে রুপোর পদক। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস-সহ বিশ্ব ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। এবং এখন তিনি বর্তমানে জাতীয় কোচ। তাই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে বাংলাবাসীর একজন প্রতিনিধি হয়ে আবেদন রাখছি মধুমিতা দিদিকে পদ্মশ্রী খেতাব এবার দেওয়া হোক!

মিলন রায়। পোঃ মালিয়াড়া, জালানপুর। জেঃ বাঁকুড়া পিন : ৭২২১৪২

হুজুগ ও অনুরাগ এক নয় বলেই আমরা ব্যর্থ

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'খেলা'-র সম্পাদকের কাছে কলমে পত্র লেখক সোমনাথ পাল ('দেশ' পত্রিকার ১৭-৮-২০০৪ সংখ্যার, ২৫ নম্বর পাতা চুরি করে), 'বিশেষজ্ঞ'র মত জাহির করেছেন, আমেরিকান, রাশিয়ান ও চীনারা পদক পান— উন্নত ডোপিং করে, অথচ ভারতীয় 'নন্দ ঘোষ'রাই শুধু ধরা পড়েন। নিজে খেলাধুলো না করে, বছরের পর বছর শুধু কাগজের খেলার পাতাগুলো চুটিয়ে মুখস্থ করে যাওয়া সোমনাথবাবুর জানা নেই, নন্দ ঘোষরা আলোকবর্ষ দূরত্বে পিছিয়ে। আধুনিকতম ডোপিং পুরোমাত্রায় করলেও এখনই এই দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে না। আমেরিকান বা রাশিয়ানরা গত ১০০ বছর ধরেই পদক পেয়ে আসছেন কারণ, খেলাধুলোটা ওঁদের অন্যতম সংস্কৃতি (খেলাধুলো না করে, শুধু ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার লালসায় পত্রিকায় চিঠি ছেড়ে, ইয়ার দোস্তদের কাছে হিরো হওয়ার বাসনা নয়)। হুজুগ ও অনুরাগ এক নয় বলেই, আমেরিকান/ রাশিয়ানরা সফল ও আমরা ব্যর্থ। গত সিডনি অলিম্পিকের কয়েক মাস আগে, এই সম্পাদকের কাছে কলমেই, পাতা জোড়া প্রবন্ধ লিখেছিলাম, 'যে চায় না, সে পাবে কেন?' সোমনাথবাবুর চিঠিতে উল্লেখিত ৯ সেকেন্ড সময়ে ১০০ মিটার দৌড়ের গতি অর্জন করা, ডোপিং করেও সম্ভব নয়। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে, যে কতখানি দূরত্ব অর্জন করেন অ্যাথলিটরা, খেলাধুলো না করা বিশেষজ্ঞের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ব্রহ্মাণ্ডের ৯০ শতাংশ , যেমন দেখা বা অনুভব করা যায় না , ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত Big Bang theory যেমন, নিছকই ছেলেভোলানো গল্প, নন্দ ঘোষদের স্রেফ ডোপিং করিয়ে পদক পাওয়ানোর চিন্তাও তেমনি হাস্যপদ ও অজ্ঞতাপূর্ণ। (১২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়োনো, ৩/৪ মাইল দৌড়োনোর স্ট্যামিনার খেলোয়াড়দের হাতে পেয়ে, তাই কনস্টানটাইনকে বিপদে পড়তে হয়। তার ওপর আবার আছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, শত্রুতা,অন্তর্ঘাত)।

দেবাশিস চক্রবর্তী। *ইন্দিরা অ্যাপার্টমেন্ট, প্রান্তপল্লী, মালদা-৭৩২১০১*

ঠিক বুঝতে পারছি না

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

আজ একটি জরুরি বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করব। তার আগে একটা দুঃখের কথাও ভাগ করে নিতে চাইছি। 'খেলা'-র এক নিয়মিত পাঠককে আমি অজান্তে কিছুটা দুঃখ দিয়েছি বলে টের পেলাম তার চিঠি পেয়ে। সেই পাঠক তার চিঠির সঙ্গে তারই কেনা 'শারদীয় খেলা' আমাদের দপ্তরে ফেরত পাঠিয়েছেন। অভিযোগ, শুধুই ইস্টবেঙ্গল-ইস্টবেঙ্গল করা হয়েছে, মোহনবাগান উপেক্ষিত এবং 'শারদীয় খেলা' বাড়িতে রাখার অযোগ্য। তেমন কোনও পক্ষপাতিত্ব আমরা কখনও প্রশ্রয় দিয়েছি বলে আমার জানা নেই। তবু সেই পাঠক দুঃখিত হয়েছেন বলে খারাপই লাগছে। কিন্তু অতি যত্নে আপনাদের জন্য যে 'শারদীয় খেলা' উপহার দেওয়ার চেষ্টা করলাম তা অন্তত একজন পাঠকের কাছেও বাড়িতে রাখার অযোগ্য মনে হয়েছে জেনে আমরা সকলেই খুব দুঃখ পেলাম। মাননীয় সংশ্লিষ্ট পাঠক, আর একবার ভেবে দেখবেন।

এই খারাপ লাগার মধ্যেই দুই বিখ্যাত ফুটবলারকে ঘিরে এমন এক সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছল যা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ষষ্ঠী দুলের বাড়ি থেকে কুখ্যাত সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার হল এবং সেই সুত্রেই পুলিস জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ষষ্ঠী দুলে ও দীপঙ্কর রায়কে ডেকে নিয়ে এসে অবশেষে গ্রেপ্তারই করে ফেলল। চলল জেরা, মামলা উঠল কোর্টে, ক্রমে দুই ফুটবলারের অসৎ সঙ্গের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হল এবং অবশেষে কিছুদিনের জন্য তাঁদের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত। জামিনও হল। বারবারই মনে হচ্ছিল হয়ত দুর্ভাগ্যের বশে এই দুই ফুটবলার অসৎ সঙ্গে পড়ে বিপথে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুটবল সংশ্লিষ্ট মহলের কিছু কিছু মহলে যে কর্মকাণ্ড চলছে তাতে আমি যারপরনাই বিভ্রান্ত। অনেকেই আমার প্রতিক্রিয়া চাইছেন। কেউ কেউ একথাও জানতে চেয়েছেন আমি কিছু লিখছি না কেন। কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া ঠিক কীভাবে ব্যক্ত করব, বা আমি ঠিক ভাবছি কিনা, অথবা যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে কিনা, বা এটা শুধুই ফুটবল মাঠের ঘটনা নাকি সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি— কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

'এই বিভ্রান্তিতে তোমাকে চাই...'। 'তোমাকে' মানে আপনাদের চাই। সে কারণেই এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা। আমি যখন খেলতাম তখন দেখেছি কলকাতা ফুটবল মাঠের দর্শক মানে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শিক্ষাগত মানের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো থেকে আসা মানুষ। এঁদের এক কথায় যদি কোনও পরিচয় দিতে হত, বলা হত মধ্যবিত্ত বাঙালি। আজও তাঁরাই কলকাতায় ফুটবলের দর্শক ও আলোচক। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় অনেকে হয়ত মাঠে আসতে পারেন না। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ আজও আছে। সেই কারণেই বোধহয় ক্রিকেট বা মোটর রেসিং বা টেনিসে শ্যাম্পেন দিয়ে বিজয়োৎসব গ্রহণযোগ্য হলেও ফুটবলের বিজয়োৎসবে শ্যাম্পেন এখনও ব্রাত্য। মধ্যবিত্ত বাঙালির যত্নলালিত সংস্কারের আরও উদাহরণ ফুটবলপ্রেমীদের কাছে পাওয়া যায়। সেই কলকাতার ফুটবল মাঠে গত কয়েক বছরে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে বেশ বড় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ফুটবলারদের পরিচয়, কিছু ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা বহু দিন থেকেই আছে। কিন্তু হঠাৎই কোনও একদিন খেলোয়াড়দের রাজনৈতিক মিটিং-এ মিছিলে ব্যবহার করা শুরু হল। সেখানেও একটা বিনিময় ক্রমে প্রকাশ্যে আসছিল— কোথাও কোনও কোচিং ক্যাম্পের দায়িত্ব, কোথাও জাতীয় পুরস্কার, কোথাও বিশ্বকাপ সফর। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রূপ বদলাতে শুরু করল এবং এই বিনিময়ের রূপও বদলাতে শুরু করল। জমি, ফ্ল্যাট, ব্যবসা। ক্রমে ফুটবল মাঠে টাকার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে কোটিতে পৌঁছে গেল। বেশ কিছু ফুটবলারের হাতে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ টাকা এসে গেল। এত টাকা কীভাবে খরচ করা বা কাজে লাগানো উচিত সেটা অনেকেই জানে না। এমন কোনও অভিভাবক বা বন্ধু ক্লাবে বা তার আশপাশে পায়নি যে সৎ পরামর্শ দিতে পারে। পরামর্শ শুধু একটাই— ভাল খেল, আরও ভাল খেল, আরও টাকা রোজগার কর। এরই সঙ্গে আরও একটা ঘটনা ঘটতে থাকল— কলকাতার ফুটবলে বাঙালি ফুটবলার দ্রুত কমে যেতে লাগল এবং মণিপুর-সিকিম জাতীয় পাহাড়ি জায়গা আর বিদেশ থেকে ফুটবলার আনা হতে লাগল। ক্লাব তাঁবুর পরিবেশ বদলে যেতে লাগল। ক্লাবগুলো যখন বাইরে খেলতে যাচ্ছে সেখানে হোটেলের পরিবেশও বদলে যেতে শুরু করল। বিদেশি ফুটবলার বা বিদেশ থেকে ঘুরে আসা (যাকে আগে বাঙালি 'বিলেত ফেরত' বলত) ফুটবলারের জীবনযাপন বাংলার ছেলেদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের থেকে অনেকটাই আলাদা। তাদের ক্ষেত্রে এই আলাদা জীবনযাপনকে শাসনের চোখে তো দেখা হলই না। বরঞ্চ লিখিত বা অলিখিতভাবে এই জীবনযাপন স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে নেওয়া হল। উদাহরণ দিতে ইচ্ছে করে না। তবু বলা যেতে পারে দল বাইরে খেলতে গেলে কোনও কোনও দলের খেলোয়াড় বান্ধবী নিয়ে হোটেলের ঘরে থাকলে তা

অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে নেওয়া শুরু হল বছর পাঁচ-ছয় আগে থেকেই। বাঙালি খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ এই ব্যাপারটাকে খুবই সাহেবি ও অনুকরণীয় বলে মনে করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের জীবনযাপনের ধারা অনুযায়ী প্রকাশ্যে এমনটা করা যায় না। এটাই বহু যত্নে লালিত সংস্কার। তাই অনুকরণ করতে গিয়ে গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হল। ঠিক এই সুযোগেই গোপন জগতে বিচরণে অভ্যস্ত কিছু সমাজবিরোধী পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল ফাইনাল, রক্তদান শিবির ইত্যাদিতে প্রধান অতিথি করার সূত্রে সেইসবফুটবলারকে বিপথের ও গোপন আস্তানার হদিশ দিয়ে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবং ধীরে ধীরে এই গোপন জগতের হিরো'রা কিছু লোভী ও দুর্বলচিত্ত ফুটবল জগতের হিরোদের টেনে নিয়ে গেল নিজেদের দলে।

এ পর্যন্ত সবটাই খুব সহজ সরল গল্প। ষষ্ঠী দুলে ও দীপঙ্কর রায়কে ঘিরে এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যা যা যে-রকমভাবে শোনা যাচ্ছে তাতে এইটুকু বুঝে নিতে কোনও বিভ্রান্তি হয় না। কিন্তু, কিছু প্রশ্ন মনে আসছে যার ঠিক উত্তর কী তা বুঝতে পারছি না। অবাধে অসংখ্য বিদেশি ফুটবলার গড়ের মাঠ ছেয়ে ফেলল, এটা কি ঠিক হচ্ছে না? তারা যদি খেলতে পারে তাহলে তাদের আটকানোর চেষ্টা করাটাও খুব সঙ্গত নয়। কিন্তু, তাদের কারণেই কি মাঠের বা ক্লাবগুলোর পরিবেশ কিছুটা বদলে যাচ্ছে? এটা নিয়ে ভাবা দরকার কি? ঠিক বুঝতে পারছি না। ষষ্ঠী-দীপঙ্করের বিপথগমন কি রাতারাতি হয়েছে? ক্লাবকর্তারা কি কিছুই জানতেন না? ক্লাবকর্তাদের পক্ষে যদিও খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পদস্খলন সম্পর্কে জানা সত্যিই খুবই কঠিন। কারণ কয়েক ঘণ্টার অনুশীলন আর কয়েক ঘণ্টার খেলা ছাড়া বাকি সময় খেলোয়াড়রা তো স্বাধীন বা কর্তাদের চোখের আড়ালে। সুভাষ ভৌমিকের যা মানসিকতা তাতে তিনি এটা নিজের কিছুটা ব্যর্থতা বলেই মনে করছেন যে খেলোয়াড়দের কুসঙ্গে পড়ার কথা তিনি জানতে পারেননি। কিন্তু এটা জানতে গেলে তো খেলোয়াড়দের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। কোনও কোচের কি তা সাজে? আর তাছাড়া কোচ কি তাঁর খেলোয়াড়দের প্রতি এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারবেন না? সুভাষ ভৌমিক গ্লানিতে ভুগলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব কল্যাণ মজুমদার বলেছেন খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন জানা ক্লাবের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক, কিন্তু এই ঘটনায় যে ক্লাবের সম্মানহানি, শুধু ক্লাবের কেন গোটা ফুটবল সমাজেরই যে সম্মানহানি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তা কল্যাণ মজুমদার যতই অস্বীকার করুন। এখানে আমার প্রশ্ন, তাহলে কি এবার থেকে দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর প্রয়োজনীয় নজরদারি করার জন্য ক্লাবে ক্লাবে টাস্ক ফোর্স গঠন করা উচিত? সেটা কি অনধিকারচর্চা বা অগণতান্ত্রিক হয়ে যাবে? ঠিক বুঝতে পারছি না। সংশ্লিষ্ট দুই খেলোয়াড় দাগি নয়। তাদের জামিন হাওয়া ভাল, তারা তো আর পালিয়ে যেতে পারবে না। (যদিও যে চক্রে পড়েছে তাতে প্রমাণলোপের উদ্দেশ্যে প্রাণহানির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।) কিন্তু কিছু অপরাধ খেলোয়াড়রা নিজেরাই স্বীকার করেছে। সুতরাং লাল-হলুদ পতাকা উড়িয়ে জামিনের পর দুই ফুটবলারকে মালা দিয়ে শোভাযাত্রা করে ক্লাবে ফেরানোর ঘটনা কি খুবই কুরুচিকর নয়? লাল-হলুদ পতাকার সম্মান কি এতে খুব বাড়ল? ঠিক বুঝতে পারছি না। হাতকাটা দিলীপ-কাণ্ডে হাজতবাসী তবলাবাদক সুমন বসুর হাতে তবলা ফিরিয়ে দিতে তাকে জামিন দিতে হয়নি। জেলের মধ্যেই একজোড়া তবলা বাঁয়া সুমনকে অনুশীলনের জন্য দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠীদের পায়ে বল ফিরিয়ে দিতে গেলে তাদের জামিনই বোধহয় দিতে হয়। কারণ তারা জাতীয় দলের খেলোয়াড়। কিন্তু, তারা তো আর খুন করেনি— এই যুক্তি শুনে একটা প্রশ্ন আসছে। খুন তো করেনি, কিন্তু বিভিন্ন মধুচক্রের নিয়মিত সদস্য হিসেবে বারবার তাদের নাম আসছে। এটা ক্রমে একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। এই ব্যাধি সংক্রামকও বটে। এ ব্যাধি যাদের আছে তাদের পায়ে বল ফিরিয়ে দিলেও কি তারা উন্নততর ফুটবল খেলতে পারবে? খেলা সম্ভব? প্রশ্ন হল এদের সুপথে ফেরানোর দায়িত্ব সুভাষ ভৌমিক একলা নিলে কি সফল হতে পারবেন? শুধু দুই বড় ক্লাব নয়, কলকাতার মাঠের সমস্ত ক্লাবের কোচ ও কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার বোধহয়। বিশেষ করে বড় ক্লাবগুলো, যে ক্লাবের খেলোয়াড়দের হাতে অফুরন্ত অর্থ, যার অপব্যবহারের সুযোগও অফুরন্ত, সেই সব বড় ক্লাবের কি বিশেষ কোনও নিয়মশৃঙ্খলা প্রচলন করা উচিত যে নিয়মশৃঙ্খলা সমানভাবে ক্লাবের সব খেলোয়াড়ের ওপর প্রয়োগ করা যাবে? এটা কি সম্ভব? নাকি যে খেলোয়াড় যখন দর্শক-সমর্থকদের নয়নের মণি হয়ে উঠবে তার সাত খুন মাপ এখনও আছে তখনও থাকবে? ঠিক বুঝতে পারি না। এই নিয়মশৃঙ্খলা কি শুধু খেলোয়াড়দের জন্য তৈরি করাই যথেষ্ট? নাকি কর্মকর্তাদের জন্যও ক্লাবের কিছু নিয়মশৃঙ্খলা তৈরি করা দরকার? আই এফ এ যেমন সুভাষ ভৌমিক মূর্খ বা অপদার্থ বললেই শাস্তির বিধান দেয়, আর তাদেরই নির্বাচিত বাংলার কোচ নঈমুদ্দিন সন্তোষ ট্রফিতে দলের সঙ্গে গেলও না, এলও না। কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

তবে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা আমায় খুবই অস্থির করে তুলেছে সেটা একটু স্পর্শকাতর। একটা নয়, কয়েকটা প্রশ্ন। দুজন প্রকাশিত এবং কিছু অপ্রকাশিত বিপথগামী ফুটবলারকে সুপথে ফেরানোর চেষ্টা করাটা সহজ, নাকি এদের বাদ দিয়ে ফুটবল সমাজের কাছে, ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্তমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়াটা সহজ। তিরিশ ছুঁই ছুঁই দু-পাঁচজনকে সুপথে ফেরানো কি সম্ভব? এদের সংশোধন অযোগ্য অপরাধী বলে বাতিল করাটা কি অমানবিক? দু-পাঁচজনের জন্য কি গোটা ফুটবলজগৎ থেকে সচেতন মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবে? এদের বাঁচানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি ফুটবলকে নিষ্কলুষ রাখা? নাকি এদের সুপথে ফিরিয়ে একই সঙ্গে ফুটবলকে নিষ্কলঙ্ক রাখা? কোনটা গুরুত্বপূর্ণ? কোনটা সম্ভব? কোনটা মানবিক? কোনটা চেতনাগ্রাহ্য? বুঝতে পারছি না, ঠিক বুঝতে পারছি না।

মালার জ্বালা

ধীমান দত্ত

'হ্যাঁ' ৪২%। 'না' ৫৬%। 'জানি না' ২%। আজকালের জনমত বিভাগে উত্তর। প্রশ্ন ছিল, ষষ্ঠী-দীপঙ্করের পাশে দাঁড়ানো উচিত সব ফুটবলারের? ওই ৫৬% 'না'-এর ওপর ভরসা রেখে দুই বিখ্যাত ফুটবলারকে আক্রমণ করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ষষ্ঠী-দীপঙ্করের গ্রেপ্তার হওয়া থেকে জামিন পাওয়া পর্যন্ত এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে গেল, অবাক না হয়ে উপায় নেই। কত কী যে দেখা ও শেখা গেল!

এই দুই ফুটবলার, কোনও সন্দেহ নেই, চরম অন্যায় করেছেন। ভুলটুল নয়, অন্যায়। অপরাধ। কুখ্যাত দুষ্কৃতীর ভয়ঙ্কর চক্রেই শুধু জড়িয়ে পড়েননি, এমন এক দাগি অপরাধীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পুলিস যাকে প্রচণ্ডভাবে খুঁজছিল, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 'ধরবই' বলে ঘোষণা করেছিলেন। হাতকাটা দিলীপের সঙ্গে কেন ঘনিষ্ঠতা, কীভাবে ঘনিষ্ঠতা, ব্যাপারটা আরও কত গভীরে শিকড় বিস্তৃত করেছে, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে সেই কালো রহস্য একদিন আলোয় আসবে। কিন্তু ষষ্ঠী-দীপঙ্করের জন্য সহানুভূতির যে দুর্বোধ্য জোয়ার দেখা গেল, তা নিশ্চিতভাবেই অভূতপূর্ব। শুধু হাপুসহুপুস মায়াকান্নায় থেমে থাকলে বিশেষ কিছু হয়ত বলার দরকার হত না, কিন্তু কেউ কেউ কিছু অন্যায় আক্রমণ শুরু করেছেন। জবাবটা দেওয়া দরকার।

একটা কথা বলে নিই, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অসম্ভব সংযত আচরণ, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করা আমাদের ছুঁয়ে গেছে। কর্মকর্তারাও ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কারও কারও মতো বিচিত্র আচরণ করেননি। প্রথম দিন ষষ্ঠী-দীপঙ্করকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, পুলিস কথা বলতে চায় শুনে পরদিনই ফিরিয়ে এনে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। গ্রেপ্তার না করার অনুরোধ করেছেন, তাতে কাজ না হওয়ায় আইনজীবী ঠিক করেছেন, একইসঙ্গে পুলিসকেও অনুরোধ করেছেন, দয়া করে ওঁদের অন্য আসামিদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না, একটু অন্য চোখে দেখবেন। অনুরোধই, এর বেশি কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত আদালতে লড়ে জামিনে মুক্ত করে আনতে পেরেছেন। একবারও কেউ আবোলতাবোল বিবৃতি দেননি, হুঙ্কার ছাড়েননি। কোচ সুভাষ ভৌমিকের ব্যাপারটা বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না। ফুটবলারদের সত্যিই সন্তানের মতো ভালবাসেন, নিজেই বলেন, তিনি ওঁদের বাবার মতো। এই বিপদে তাই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। সুভাষই সবচেয়ে বেশি তিরস্কার করেছেন ষষ্ঠী-দীপঙ্করকে, আবার তিনিই থানায় গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে এসেছেন। জানিয়েছেন, সুস্থ পথে ওদের ফেরাতেই হবে। কোচ-কর্তারা, সুতরাং, ষষ্ঠীদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন, অথচ বালখিল্যসুলভ কিছু করেননি। কিন্তু অন্যরা এ সব কী করে ও বলে চলেছেন?

অঞ্জন নাগ! ময়দান স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের স্বঘোষিত কর্ণধার রীতিমতো লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিলেন। জনসভা। সই সংগ্রহ। আদালতের সামনে মুখে কালো কাপড়। ছাড়া পেতেই মাল্যদান! তিনি ও তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুচর প্রথমদিকে নিজেদের হাসির খোরাক করে তুলছিলেন, কিন্তু শেষ কাজটার জবাব শুধু নিঃশব্দ হাসিতেই দিতে পারি না আমরা। মালা? ওঁদের? মালা তো পরানো হয় মহৎ কাউকে। জয়ী সফল বীরকে। তা কী এমন অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শন করে এলেন ষষ্ঠী-দীপঙ্কর যে, জিন্দাবাদ ধ্বনিতে রজনীগন্ধা-গোলাপে বরণ করতে হবে? আমাদের ভাল লাগত, যদি লজ্জায়, জ্বালায় ওই মালা সবার আগে টান মেরে খুলে ফেলতেন ষষ্ঠীরাই।

বেশ কিছু অভিযোগ, সমালোচনা শোনা গেল, প্রধানত সংবাদমাধ্যমেরই দুই-একটি অংশে। এক, মিডিয়া খুব বাড়াবাড়ি করছে, যেন হাতকাটা দিলীপ নয়, দীপঙ্কররাই বড় অপরাধী। দুই, এঁরা তো দাগি নন, কেন লকআপে রাখা হবে? তিন, আসল মাথাদের ধরার ক্ষমতা নেই, এঁদের ওপর জোর ফলানো হচ্ছে। চার, পুলিস খেতে দিচ্ছে না, বাইচুংকেও খাবার দিতে দেয়নি। এবং পাঁচ, এঁরা নামী ফুটবলার, অতএব মুক্তি

চাই। জবাবটাও আমরা নম্বর ধরে ধরে দিই।
এক, মিডিয়া আদৌ বাড়াবাড়ি করেনি। কাগজে ষষ্ঠী-দীপঙ্করের ছবি-খবর বেশি, স্বাভাবিক। খ্যাতির জ্বালা। বিখ্যাতদের ছবি-খবরই তো ছাপা হবে। গোটা বিশ্বে কত লোক অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, মডেল ও নানা নারীকে জড়িয়ে খবর-ছবিতে দেখা যায় বেকহ্যাম, বথাম, গ্যাটিংদের। অবৈধ পিতা অসংখ্য, কতটুকু খবর বেরোয়? বেরোয়, যখন সেই পিতার নাম হয় মারাদোনা বা পেলে। ধর্ষণের আসামি কম নয়, মাইক টাইসনের মতো প্রচার কে পেয়েছেন? খুন করে যাচ্ছে কত লোক, তারা কি কাগজে নবজ্যোত সিধুর মতো জায়গা পায়? খুন হন কত লোক, জানাই যায় না, সৈয়দ মোদি খুন হলে কিন্তু প্রথম পাতার শিরোনাম। চিরকালীন নিয়ম, রাগারাগির কিছু নেই। হাতকাটা দিলীপের চেয়ে ষষ্ঠী-দীপঙ্করের গ্রেপ্তার অনেক অনেক বড় খবর, সহজ ব্যাপার। টিভিতে যে অনুষ্ঠানে ষষ্ঠীদের জন্য সবচেয়ে বেশি অশ্রুপাত, মিডিয়াকে সবচেয়ে বেশি গালাগালি, তাদেরও সচিত্র কভারেজের ৮০ শতাংশ জুড়ে ওই দুই ফুটবলার!
দুই, হ্যাঁ, দাগি নন, কিন্তু অপরাধী তো বটেই দীপঙ্কর ও ষষ্ঠী। বহুদিন ধরেই কুপথগামী। আর শুরুতে কেউই দাগি থাকেন না, হাতকাটা দিলীপও ছিল না।
তিন, আসল মাথাদের নাকি ধরা যাচ্ছে না। বেশ তো, তীব্র সমালোচনা হোক। কিন্তু নিজের বাড়িতে দুষ্কৃতীর আশ্রয়দাতাকে ধরলেও সমালোচনা হবে? পঞ্চাশ লাখের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কিনারা যদি করা না যায়, দশ লাখের কোনও ডাকাতকে ধরতে পারলেও ছেড়ে দিতে হবে? এ তো আবদারের মতো শোনাচ্ছে।
চার, পুলিস খেতেই দেয়নি? কথাটা সম্ভবত পুরোটা ঠিক নয়। একজন ফুটবলারের পুষ্টির জন্য যা যা খাবার দরকার, ষষ্ঠীরা তার সবটা নিশ্চয় পাননি, থানায় তো আর বাড়ির খাবার পাওয়া যায় না। এগুলো অপরাধচক্রে ঢুকে পড়ার আগে মাথায় রাখা উচিত ছিল। তা ছাড়া বন্দীকে সুস্থ রাখাটাও পুলিসের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, বিরিয়ানি-মাংস কেউ নিয়ে গেলেই ওরা খেতে দিতে বাধ্য নয়। বাইরের খাবার সরাসরি দেওয়ার নিয়মই নেই। কেউ বিষ মিশিয়ে পাঠাতে পারেন, সাক্ষ্য ও সাক্ষী লোপাটের চেষ্টায়। বাইচুং ভুটিয়া নিশ্চয় বিষ মিশিয়ে নিয়ে যাননি, আমরা জানি। সবাই জানে। পুলিসও জানে। আর জানে বলেই তো পরদিন এস পি নিজে সুভাষকে ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেন, খাবার নিয়ে যেতে বলেন। এই যে 'বিশেষ সুবিধা', সে তো এঁরা ফুটবলার বলেই।
এবং পাঁচ, না, তবু ফুটবলার হলেই যা খুশি করা যায় না। করলে মুক্তি চাওয়া যায় না। চাইলে পাওয়া যায় না। যে প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে হল কদিন ধরে, তার মূল কথা, এঁরা ফুটবলার! তাতে কী হল? সে জন্য আইন বদলে ফেলতে হবে? এটা হয় নাকি! আইন তো বরং ঠিক উল্টোটাই শেখায়, 'সবার জন্য এক'। আইনেরই নির্দেশ, কে কী 'করেন' নয়, কে কী 'করেছেন', সেটাই একমাত্র বিচার্য। গায়ক, অভিনেতা, সাহিত্যিক, খেলোয়াড় আর সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনের শাস্তিতে ফারাক নেই। আর শুধু জবাব নয়, এবার আমরাই কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বিখ্যাত অভিনেতা হয়েও টাডা আইনে গ্রেপ্তার হননি সঞ্জয় দত্ত? প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট অবতার সিং হোটেলে মধুচক্র চালিয়ে গ্রেপ্তার হননি? তখন এই জনসভাওয়ালারা কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল সহানুভূতির হাওয়া? অবতার আর ষষ্ঠী-দীপঙ্করকে কোন চোখে আলাদা করছি আমরা? সমাজের বিশিষ্ট কেউ গ্রেপ্তারটেপ্তার হয়ে একটু 'বিশেষ সুবিধা' পেলে এতদিন তো এঁদেরই অনেকে সমালোচনায় ফেটে পড়েছেন, তাঁরা ষষ্ঠী-দীপঙ্করের 'বিশেষ সুবিধা' দাবি করছেন কোন অধিকারে?
দাবি উঠেছে, ফুটবলারের পায়ে বল ফিরিয়ে দিতে হবে। আমরাও দেখতে চাই ষষ্ঠীদের, বল পায়েই। লকআপ নয়, সবুজ মাঠই ওঁদের জায়গা। কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়। যাঁরা আজ ওঁদের সমর্থনে ও প্রশাসনের বিরোধিতায় ফেটে পড়ছেন, তাঁদের চেয়ে খেলোয়াড়দের পাশে অনেক, অনেক বেশি দাঁড়িয়েছি আমরা। কারণ আমরা বিশ্বাস করেছি, ওঁরাই গড়েন চরিত্র। মাঠে খেলোয়াড়রাই সব, ওঁরাই আনেন সম্মান, গৌরব— ক্লাবের জন্য, রাজ্যের জন্য, দেশের জন্য। কিন্তু যখন সেই খেলোয়াড়দেরই কেউ সম্মানের বদলে একতাল পাঁক আর আবর্জনা নিয়ে আসেন, একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে পড়া যায়? ষষ্ঠী-দীপঙ্করের ভাল ওই বিচিত্র ধ্বজাধারীদের চেয়ে কিছু কম চাই না আমরা। সুস্থ জীবনে ওঁরা ফিরে আসুন। মালা ছিঁড়ে ফেলুন। মাথা তুলে দাঁড়ান। মাঠে ফিরুন। বলও ফিরুক পায়ে। কিন্তু দয়া করে মনে রাখুন, খেলোয়াড় বলেই আপনাদের কর্তব্যও অনেক বেশি। ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়, চরিত্র গড়তে হয়, কত স্বপ্ন-দেখা কিশোর-তরুণ যে আপনাদের দেখেই শেখে, বড় হয়। সমাজের প্রতি বিরাট দায় তো ষষ্ঠী-দীপঙ্করদেরই, কোনও হাতকাটা-কানকাটার নয়!

দুঃসময়ের গল্প



অলক চট্টোপাধ্যায়

১

দুঃসময়ের গল্প অন্যরকম হয়। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে ব্যর্থতার সুর বাজে তা-ই নয়, সমালোচনার ওপর গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়ানোতেও তখন বাড়তি উৎসাহ দেখা যায়। আলোচনা কর্মেও আসে কম-বেশি ভারসাম্যহীনতা, দেখা যায় বিস্মরণও।

চলতি মরসুম ভালভাবে শুরু হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট দলের। ফর্মে জং ধরেছে বলে তারারা মোক্ষম মুহূর্তে কেঁপেছেন। যোগ্যতা সম্পর্কেই সন্দেহ হয়েছে; অনেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে খেলোয়াড়দের পাওয়া আঘাত সম্পর্কেও সহানুভূতিশীল হতে চাননি। সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে প্রত্যাশার নিকট সম্পর্ক হলে মনের মধ্যে অন্য এক ক্যালেন্ডার ঝুলতে থাকে। মাস তিনেক আগে শ্রীলঙ্কায় এশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই থেকেই সেই মনের ক্যালেন্ডারে সময়ের ঘরগুলোয় কালো গোল্লা দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। তারপর হল্যান্ড, ইংল্যান্ড— সর্বত্র যতগুলো একদিনের ম্যাচ খেলা হয়েছে, কোথাও গত বছরের ভারতীয় দলকে নিজেদের আসল চেহারায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। সব ব্যর্থতা ভুলে যাওয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট-প্রেমিকদের

একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল স্বদেশে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট-সিরিজটাকে ঘিরে। শেষ টেস্টে বিতর্কিত পিচে ভারত জিতে হারজিতের ব্যবধান ২-১ করলেও ভারতীয়দের ফর্মে ফেরা বা দলের সর্বাঙ্গীন অবস্থার উন্নতি ঘটা সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। দুশ্চিন্তার ছোট-বড় মেঘ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

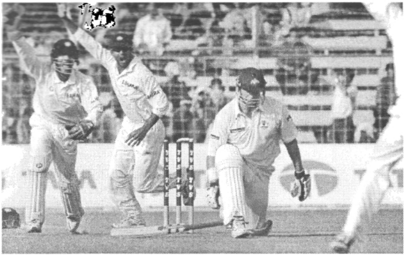
স্বজন সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা যখন, তখন সে সম্পর্কে কথাবার্তা আগে বলতে হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানে দীর্ঘকাল ধরে বলে আসছেন, ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে ফর্ম হচ্ছে অপসৃয়মান মেঘের মতো, আসে আর যায়। কিন্তু কোনও খেলোয়াড়ের বেলায় তার জাতই হচ্ছে আসল কথা। একেবারে খাঁটি উপলব্ধি। কিন্তু দু'একটা ছোট কথাও এখানে বলা দরকার। জাত খেলোয়াড়ও তুচ্ছ ফর্মের অনুপস্থিতিতে নাকাল হতে থাকেন। কারও কারও অবস্থা এমনও হয় যে, নির্বাচক থেকে সমর্থকরা পর্যন্ত— সকলেই তখনই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। উদাহরণ সাম্প্রতিক সিরিজে প্রথম ৬টা ইনিংসের ভি ভি এস লক্ষ্মণ। তাঁর ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় সমর্থকরা প্রথমে অবাক এবং পরে চূড়ান্ত হতাশ হলেও লক্ষ্মণের প্রতিভা কখনও বিস্মৃত হননি। অন্যদিকে আকাশ চোপড়া কোনও দিন সুনীল গাভাসকার হবেন এমন কথা ভুল করেও কেউ যেমন ভাবেননি, তেমন তাঁর ফর্মে না-থাকা ব্যাটিংয়ের চেহারা এতটা খারাপ হবে তা-ও কেউ প্রত্যাশা করেননি। অথচ এটা ইতিহাস হয়ে রইল যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত সিরিজে তিনি (আকাশ) চারটে ইনিংসের আগে স্বয়ং গাভাসকারের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছিলেন। টেস্টে ওপেনার হিসেবে যুবরাজ সিংও সম্ভবত তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থকদেরও হতাশ করেছেন। সকলেই, বিশেষ করে নির্বাচকরা বুঝে গেছেন আকাশ চোপড়া ও যুবরাজ সিংকে টেস্ট ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে ফিরে আসতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বিস্তর রান করতে হবে, ওপেনার হিসেবেই। প্রায় গোটা দলের শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গী হিসেবে শেষ টেস্টে অন্য ওপেনার গৌতম গম্ভীরও আমাদের উৎফুল্ল করতে পারেননি। রনজি ট্রফি বা ভারতীয় 'এ' দলের পরেই মুম্বইয়ের অদ্ভুত উইকেটে ম্যাকগ্রাথ ও গিলেসপির সামনে পড়ে সফল হওয়া তো মোটেই সহজ কাজ নয়, তাঁকে আরও দু'একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। শুধু একজন বা দু'জনের একটা বা দুটো টেস্টে ব্যাটিং ব্যর্থতাতেই ভারতীয় দলের অবস্থা অন্ধকারময় হয়নি। দুশ্চিন্তা হয়েছে গোটা দলের ব্যাটিং মানসিকতা নিয়েও। 'টিম ইন্ডিয়া'-র যে ব্যাটিং-তারকাদের নিয়ে আলোচনা হয়, তাঁদের মধ্যে একমাত্র কিছুটা সাফল্য পেয়েছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। অন্যদের ব্যক্তিগত স্কোর আতস কাচের তলায় ফেলে দেখার মতো। শচীন তেন্ডুলকার আঘাত থেকে অবশেষে ফিরলেও নাগপুর টেস্টে তাঁর ব্যাটিংয়ে পরিচিত আত্মবিশ্বাসের কোনও ছাপ ছিল না। সব চেয়ে অবাক হতে হয়েছিল লক্ষ্মণের ব্যাটিং দেখে। লক্ষ্মণ চিরকালই একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং শরীর থেকে দূরের বল খেলেন। কিন্তু ব্যাটে-বলে হতে থাকলে টাইমিং, কব্জির মোচড়, সাহস এবং প্রতিভার স্পর্শে যখন ক্রমাগত



শেহবাগের সঙ্গে শচীনও যদি পুরনো ফর্মে ফেরেন!

রোমহর্ষক স্ট্রোক নিতে থাকেন, তখন লক্ষ্মণকে একেবারে অলৌকিক ব্যাটসম্যান মনে হয়। সেই লক্ষ্মণের কী হয়েছে সেই অস্থির প্রশ্ন প্রথম তিনটি টেস্ট সহ মুম্বইয়ের চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংস পর্যন্তও উদ্বিগ্ন ক্রিকেট-প্রেমিকদের মনে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাহুল দ্রাবিড় হয়ত শেষ দুটো টেস্টে নেতৃত্বের ভারের জন্য খানিকটা বাড়তি চাপের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে রাহুলের খেলায় কখনও স্বাভাবিক দাপট প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং মনে হয়েছিল তিনি তিন বছর আগের জামা খুঁজে আবার গায়ে দিয়েছেন, যে-জামা পরলেই শুধু ব্যাট হাতে আত্মরক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু মনে থাকে না। নাগপুর টেস্টে ১৭৩ মিনিট ব্যাট করে ১৪০টা বল খেলে ২১

[illegible] ইনিংসে তিনি নিজেই [illegible] পর এক বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান আউট হতে [illegible]ছিলেন! মহম্মদ কাইফ আর পার্থিব প্যাটেল প্রতিরোধ না গড়লে ভারত মুম্বই টেস্টের মতো অকিঞ্চিৎকর রানের ইনিংস শেষ করত। সৌরভ গাঙ্গুলি বাঙ্গালোর টেস্টের প্রথম ইনিংসে খারাপ খেলছিলেন না, কিন্তু তার পরের দুটো ইনিংসে তাঁর ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাস অনুপস্থিত ছিল।



হেডেন বোল্ড। হরভজনের বলে।

কেউ অবশ্য একথাও বলতে পারেন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও আত্মসম্মানবোধ— এগুলো তেমন সহজলভ্য নয় যে জনৈক শশাঙ্ক মনোহরেরও তা থাকবে। তবে সেই শশাঙ্কচন্দ্রের বোঝাবুঝির ক্ষমতাকে কিছুতেই ছোট করে দেখা চলে না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন ঘাস থাকা উইকেটে সেভাবে ব্যাট করতে পারেনি বলেই ভারতীয় দল হেরেছে। তিনি আরও বুঝতে পেরেছেন, ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিজেদের দোষ স্বীকারের সাহস নেই। এবং তাঁর পরের উপলব্ধি— পিচ যদি বোলারেরই তা হলে অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন ও ক্লার্ক ইচ্ছেমতো রান করেছে কী করে! কারও বিশ্লেষণ ও আবিষ্কারকে সহজে অবহেলা করা যায় না। মনোহরমশাই একথা পরিষ্কার বুঝেছেন যে, নাগপুরের সিমিং উইকেটে ম্যাকগ্রাথ-গিলেসপি জুটি আর জাহির খান-আগরকার জুটির ভেদশক্তিতে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। বিশেষ করে অজিত আগরকার যখন দারুণ বোলিং-ফর্মে ছিলেন! নাগপুরের কর্মকর্তারা অর্থাৎ বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দেখা গেল খুবই নিয়মনিষ্ঠ ক্রিকেট ভক্ত সংস্থা। বোর্ড থেকে প্রতিনিয়ত লিখিত নির্দেশ না পেলে তারা কিছু করে না। তাদের মাথায় তারা সব সমস্যা ঢোকাতেও চায় না। সেই কর্মকর্তারা বুঝেছেন দেশের অধিনায়ক তাঁদের কেউ নয়, এমনকি বোর্ডেরও কেউ নয়। দেশের ক্রিকেটের সর্বাঙ্গীন উন্নতি চান বলেই তাঁরা ঘাসের উইকেট করেছিলেন। সব কিছুই একই বা স্বাভাবিক রকম হবে কেন! বৈচিত্র্য চেয়েই হয়ত তাঁরা নিজেদেরই যাত্রাভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। সেই কাজে নিজেদের নাক না কাটলে সাফল্য পাওয়া যায়?

আমাদের ডালমিয়াধন্য ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও চরিত্রে সাক্ষাৎ শালগ্রাম শিলা। ঘোর সন্দেহ হয়, বোর্ড-কর্তারা স্বদেশে টেস্ট-সিরিজ চলতে থাকলে তাঁরা ঘটনার গতিপ্রকৃতি কখনও লক্ষ্য করেন কিনা! দেশের অধিনায়ক যখন অপমানিত হচ্ছেন তখন তাঁর ক্রিকেট বোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে ও দেশের স্বার্থরক্ষার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা উচিত ছিল না? সেই সময়ে ফ্যাক্স বা ই মেল পাঠিয়ে ঘাস কাটার নির্দেশ পাঠাতে কী অসুবিধা ছিল? এখন শোনা যাচ্ছে ঘটনার খোঁজখবর তদন্ত ইত্যাদি হবে। এখন আর লাফালাফি করে কী হবে? হয়ত অন্য সহজবোধ্য কারণটিই সত্য। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিরোধী রাজ্য সংস্থা বলে হয়তো তাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে সাহস বা উৎসাহের অভাব হয়েছিল।

২

হেরে গেলে বা ক্রমাগত হারলে সমালোচকরা উৎসাহিত হন। হবেন না-ই বা কেন, পৌষ মাস তো শুধু কারও ব্যক্তিগত ক্যালেন্ডারেই থাকে না! এবং পৃথিবীর সকল ক্রিকেট-অধিনায়কের মতো নাগপুর টেস্ট পর্যন্ত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকেই সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সমালোচনারও একটা চরিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল। যুক্তির কথা থাক, কারণ সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ যুক্তিই নিজস্ব কুটির শিল্প। সন্দেহ, অপছন্দ একে অপরের জড়িয়ে গেলে, জড়িয়েই থেকে গেল তা থেকে মুক্তি নেই। শচীন তেন্ডুলকার বা সৌরভ গাঙ্গুলির আঘাত নিয়ে সন্দেহ করলে অসম্মান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সততা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যর্থ বা সৌরভের দল হারছে— এ সবের সমালোচনা হতেই পারে। কিন্তু ঘাস কাটা হয়নি বা পছন্দসই পিচ পাননি বলে সৌরভ নাগপুরে খেলেননি— এই অভিযোগ হাস্যকর। নাগপুরে সৌরভ অপমানিত হয়েছিলেন— এটা বিস্মৃত হওয়া কঠিন হবে। দেশের অধিনায়কের অনুরোধ শোনেনি দেশেরই একটা রাজ্য সংস্থা বা জনৈক শশাঙ্ক মনোহর— এটা কোনও সুস্থ ও স্বাভাবিক উদাহরণ হয়ে রইল না। মুম্বইয়ের উইকেটে টেস্ট-ক্রিকেটের পক্ষে ভাল নয়— এটা মনে রাখতে হবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার গোটা দল থুতু ফেলা ও কুৎসিত গালাগালি সহ যেমন আচরণ করেছে তার মধ্যে কোথাও ক্রিকেট নেই। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন তো এলোমেলো বাউন্স ও ম্যাচের শেষদিনে বল নিচু হয়ে প্রায় গড়িয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ তো সেখানে এমন কুৎসিত আচরণ করেনি। কোনও দল থুতুও ফেলেনি। গালাগালি, অভিযোগ ইত্যাদিকে অস্ট্রেলিয়া কতদূর নিয়ে যেতে পারবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে আই সি সি যদি মুম্বইয়ের উইকেট প্রসঙ্গে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেয়, তা হলে টেস্ট ক্রিকেটের পিচ নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে সর্বত্র, সব দেশে একই রকম পিচ হয়। প্রাকৃতিক কারণেই সেটা কখনও সম্ভব নয়। তা ছাড়া আই সি সি-কে অতটা উদ্যোগী বা কর্মোক্ষম সংস্থা মনে করারও কোনও কারণ নেই। দেশে দেশে কম-বেশি ছোঁড়া-বোলারদের নিয়ন্ত্রণ করতেই যারা পারে না, তাদের দ্বারা কোনও বড় কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং যেমন চলছে তেমনই চলবে।

তেমনই চলবে বলার অর্থ প্রত্যেক দেশে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পিচ বন্দোবস্ত করবে। কখনও শোনা যাবে না যে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ এবারের টেস্ট সিরিজে চেন্নাইয়ে যেমন উইকেট ছিল তেমন হবে। কক্ষনোও তা হয় না। কারণ নাগপুরের শশাঙ্করা অতি দুর্লভ প্রজাতি।

৩

গবেষণা ও দোষারোপ-বাসনা একই সঙ্গে মিশে গেলে সেই হাঁসজারু রূপে-গুণে বড় অপরূপ হয়। পশ্চিম ভারতের কিছু সংবাদপত্র সৌরভের নাগপুর টেস্টে না খেলার বিচিত্র ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিল। সে প্রসঙ্গের ওপর এখন ধুলো পড়তে শুরু করেছে। তবে কেচ্ছা-প্রকাশের প্রবণতায় বোধহয় 'হাওয়া-ব্রেক, সাবধানে বসিবেন' চলে না। নিজেরা কতটা সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ তা বোঝানোর চেষ্টা করেই চলতে হয়। সেই সময় জানা গিয়েছিল এখন প্রবল অপছন্দের পার্থিব প্যাটেল সম্পর্কে কিরমানি একদা কতবার কী ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের কিরণ মোরে প্যাটেলকে দলে রাখার জন্য কিছুকাল

আগে পার্থিবকে সমালোচনাকারী কিরমানিকে কী ধরনের অপমানকর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তা-ও জানা গেল। বাক-স্বাধীনতায় সব কথা ফাঁস করে দিয়েছেন কীর্তি আজাদ। কারণ তিনি এখন আর নির্বাচক নন।

সমালোচনা ও আলোচনায় শোনা গেল আরও অনেক কিছু। ভৌগোলিক সীমায় তাদের আবদ্ধ করবে কে? মার্ক ওয়া মনে করেছিলেন সৌরভ এখন ভারতীয় দলের বোঝা, অধিনায়ক হিসেবেও সৌরভের বুদ্ধি-বিচারে নাকি বিস্তর ভুল রয়েছে। নেতৃত্বের প্রশ্নে চেন্নাই টেস্টে গিলেসপির ২৪২ মিনিট (১৬৫টি বল) খেলার কথা বলেছিলেন। সিডনির একটা কাগজে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় দলের উপদেষ্টা সুনীল গাভাসকারও নাকি বলেছেন নেতৃত্বের ভার সৌরভের ব্যাটিংয়ের ক্ষতি করছে। মার্ক ওয়া তাতে হয়ত আরও উৎসাহিত হয়েছেন। সিরিজ শেষ হওয়ার পর আবার প্রবল উদ্যমে সৌরভকে আক্রমণ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার এক কাগজে তাঁর ব্যক্তিগত কলমে মার্ক ওয়া তাঁর কৌশল জারি রেখেছেন। ইংরেজদের ভেদবুদ্ধি প্রয়োগের মতো মার্ক ওয়া বলেছেন— 'সৌরভের মন পিচ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নতুন কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পাচ্ছে না।' নতুন অধিনায়ক হিসেবে চাইছেন তিনি। বিদেশে নাকি সৌরভের দলের সাফল্য-ব্যর্থতা একেবারে নারকীয়। গত বছরে অস্ট্রেলিয়ায় যে সাফল্য তা নাকি সেখানকার ধীরগতির ঘূর্ণি উইকেটের জন্য। তাঁর দেশের ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটের কথাও তিনি লিখেছেন। ভারতকে নাকি এমন খেলোয়াড় তৈরি করতে হবে যারা সব উইকেটে খেলতে পারে, শুধুই ঘূর্ণি উইকেটে নয়। গত বছরে ম্যাকগ্রাথ আর শেন ওয়ার্নের অনুপস্থিতির কথাও বলেছেন মেজ ওয়া।



সিরিজ জয়ের পরে অস্ট্রেলিয়া

মার্ক ওয়ার মনের ছবি খুব পরিষ্কার। সুদূরপ্রসারী চিন্তায় তা অন্য অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের মতোই। অস্ট্রেলিয়া খুব ভালমানের ক্রিকেটারদের নিয়ে এখন চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে তাদের বর্তমান ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মুখের কথা সক্রেটিসের মতো। বাস্তবিক সত্য হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দল বা একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার কখনও দুঃখ ভুলতে পারে না। পরাজয় মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কাজ। প্রতিশোধ নেওয়ার নানা বিচিত্র পরিকল্পনায় তারা বিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত হেরে গেলে তাদের মুখোশ খসে পড়ে। নিজের টেস্ট-জীবনের শেষ পর্বে খেলোয়াড় হিসেবে খুঁড়িয়ে চলা মার্ক ওয়া ভারতের ও সৌরভের কাছে দেশের ও স্টিভ ওয়ার পরাজয়ের স্মৃতি এখনও ভোলেননি। সৌরভকে ক্রমাগত সমালোচনা করে চাপ সৃষ্টি করার অর্থ ভারতকেই দুর্বল করা।

পিচ নিয়ে অযথা চিন্তা তো মার্ক ওয়ারই যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে। গত বছরে তাঁর স্বদেশের উইকেট করেছিল কে, নাগপুরের শশাঙ্ক মনোহর নিশ্চয়ই নয়। নিজেদের মতো উইকেট করতে কে বারণ করেছিল ওয়াদের? ম্যাকগ্রাথ ও ওয়ার্নের সুস্থ থাকা বা শাস্তিমূলক নির্বাসনে থাকার দায়ও কি ভারতীয়দের নিতে হবে? অস্ট্রেলিয়াই বরং এমন খেলোয়াড় তৈরি করুক না যাঁরা মুম্বই টেস্টের ঘূর্ণি উইকেটেও শচীন-লক্ষ্মণের মতো আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলতে পারবেন! এত বাড়তি ভালবাসা ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে? আন্ডারহ্যান্ড বল করা গ্রেগ চ্যাপেল বা বুকির কাছ থেকে ঘুষ খাওয়া মার্ক ওয়া খুব খারাপ ক্রিকেটার ছিলেন না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের সকারণ উপদেশ পাগড়ির মতো মাথায় বেঁধে রাখতে হবে। তাঁরা বরং পন্টিংকেই তালিম দিন অস্ট্রেলিয়ার উপকার হবে। গত দু-বছরে মার্ক ওয়ারা কোথায় ছিলেন যখন স্টিভ ওয়াগ মাঠে জবাব খুঁজছিলেন? গত বছরে স্বদেশে প্রশিক্ষক বুচানন কি খিচুড়ি চাপিয়ে বুদ্ধির প্যাঁচ কষছিলেন? অস্ট্রেলিয়ার এই দল নাকি ভারত-সংহারের অসাধারণ পরিকল্পনা করে এসেছিলেন। সেই জন্যই যদি তাদের সিরিজ জয়, তাহলে আর ভারতীয় দলের সব ব্যাটিং-তারকাদের ফর্ম না থাকা, চেন্নাইয়ে বৃষ্টি, হরভজন-পাঠানদের আঘাতে কী ভূমিকা থাকতে পারে! এই সিরিজেও কিন্তু ক্রিকেটীয় ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ধন্য অস্ট্রেলিয়া দলের বার দুয়েক ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটেছে। তা-ও কি গত বছর দুয়েক ধরে ভারত সফর সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা, কঠোর অনুশীলনের ফল? খেলোয়াড়দের ফর্ম ইত্যাদির কথা ভুলে বুচাননদের পরিকল্পনা সত্যি হলে হলে ব্ল্যাকবোর্ডে শেখানো ফুটবল কৌশলে ম্যাচ জেতা যেত, খেলোয়াড়দের ভাল খেলার দরকার হত না। নেট প্র্যাকটিসের সময় বুঝিয়ে দেওয়া ক্রিকেট-টিপসে ম্যাচের পর ম্যাচ জিতত যে কোনও সাধারণ দল। প্রত্যেক খেলাতেই খেলোয়াড়দের দক্ষতার জোয়ার-ভাটা থাকে। খেলার মাঠে কে বা কারা কী পারছে তার ওপরই সব নির্ভর করে, গপ্পো-গাছায় নয়। ভারতের ক্রিকেট নিয়ে এত নিদ্রাহীন চিন্তা-ভাবনা না করে নিজেদের কথাই ভাবুন মার্ক ওয়া, তাতে হয়ত ঘুম আসবে।

গ্লেন ম্যাকগ্রাথ কয়েক বছর আগেই চিরকালের সেরা ফাস্ট বোলারদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মতো বোলারকে না পেলে যে কোনও দলই ক্ষতিগ্রস্ত হত। কিন্তু একই কথা শেন ওয়ার্ন সম্পর্কে বলা যাচ্ছে না। এবারের এই প্রবল (!?!) সাফল্যের পরেও না। তিন টেস্টের ওয়ার্নের বোলিং বিশ্লেষণ— ১৪০ ওভার, ২৭ মেডেন, ৪২১ রান ১৪ উইকেট, গড় ৩০.০৭। সেরা বোলিং- ১২৫ রানে ৬ উইকেট।

এই যে ১৪টা উইকেট তার মধ্যে ৩টে টেস্টে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের সংখ্যা ৬ (লক্ষ্মণ ৩ বার শেহবাগ ২ বার, যুবরাজ ১বার)। এক ইনিংসের বোলিং হিসেবে তা যে সেরা সাফল্য (১২৫/৬) সেই ইনিংসে ভারতীয় দল করেছিল ৩৭৬। সাক্ষাৎকারে ওয়ার্ন ভারতের বিরুদ্ধে জীবনে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন। কিন্তু বিশ্লেষণের প্রশ্নে বেশি উইকেট পেলেই সেটা ভাল বোলিং হয় না, রান দেওয়া ও বোলারদের উইকেট পাওয়ার প্রশ্নটাও মাথায় রাখতে হয়। বিষান সিং বেদি একবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২৬ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছিলেন, ইংল্যান্ড দল সেই ইনিংসে করেছিল ৬২৯। প্রসঙ্গত আরও দুটো কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র শেহবাগ ছাড়া কেউই রানের মধ্যে ছিলেন না। এবং ভারতে এবার নাগপুর ছাড়া অন্যত্র স্পিনিং উইকেট তৈরি হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া দলের জয়ের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর প্রসারিত কল্পনা মিশ্রিত কাহিনী শোনা গেছে। হারার কারণ হিসেবে ভারতীয় দলের দলগত ফর্মহীনতা, খেলোয়াড়দের আঘাত ইত্যাদির কথা কিন্তু সেভাবে বলা হয়নি। চেন্নাইয়ে বৃষ্টি না হলে, তুলনায় ম্লান থাকা ভারত সেই টেস্টে জিতলে সিরিজ ২-২ হয়ে যেতে পারত। তখন অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনা-গল্পদের কী পরিণতি হতো তা সহজেই অনুমেয়। হয়ত একই সঙ্গে মার্ক ওয়াদের মতো সমালোচক ও উপদেষ্টারা একটু সমস্যায় পড়তেন।

আশা রাখাই যায়

গাভাসকার পরামর্শদাতা

সম্বরণ ব্যানার্জি



পরিকল্পনায় গলদ, ব্যাটসম্যানদের হঠাৎই ফর্ম হারানো এবং অতি অবশ্যই নোংরা রাজনীতি। অস্ট্রেলিয়া যে চতুর্থ টেস্টের আগেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলেছিল, তার কারণ এটাই। অথচ একটু ঠিকঠাক ছক কষলে অস্ট্রেলিয়া যে অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয় কিছু নয় তা তো বোঝা গেল মুম্বইতেই। অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আগ্রাসনই চাপে রেখেছিল স্টিভদের। শেহবাগের সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া, তছনছ করে দেওয়া মনোভাব, লক্ষ্মণের ছন্দ, দ্রাবিড়ের দৃঢ়তা, শচীনের সঙ্কল্প, সৌরভের সাহস ফসল ফলিয়েছিল। আত্মতুষ্টি খান খান হয়ে গেয়েছিল অসি-বাহিনীর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সমানে সমানে টক্করের জন্য প্রয়োজন ছিল সেই ব্যাটিংয়ের পুনরাবৃত্তির। কিন্তু এক সঙ্গে সব ব্যাটসম্যান ফর্ম হারালে তো ভাল পারফরমেন্সের স্বপ্ন দেখা উচিতই নয়। ঠিক তাই হয়েছেও। এমনিতে একটা দলের সবাই, যারা বিশ্ব ক্রিকেটে বাঘা, বাঘা ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত, তাদের সবার একই সঙ্গে ফর্মে না থাকা বেশ আশ্চর্যজনকই। তবে পাকিস্তান সফরের পর থেকেই কিন্তু ভারতীয় ব্যাটিং প্রত্যাশিত জায়গায় নেই। এশিয়া কাপ, হল্যান্ডে ত্রিদেশীয় একদিনের প্রতিযোগিতা, ন্যাটওয়েস্ট চ্যালেঞ্জ কাপ, আই সি সি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি— কোথাও কিন্তু চেনা দাপট দেখা যায়নি ভারতীয়দের ব্যাটে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ঝাঁঝটা উধাও। বড় রান না করলে যে বিপক্ষকে চাপে রাখা যাবে না, এটা তো ক্লাস ওয়ানের বাচ্চাও বোঝে। অথচ একমাত্র শেহবাগ ছাড়া আর কেউই তো রান পেল না। ময়না তদন্তে এর পরেই আসবে ক্রীড়াসূচি। কোথায় চেন্নাইয়ের প্রচণ্ড গরমে ওদের প্রথম টেস্ট খেলাবে, নাস্তানুবাদ করবে মানসিকভাবে, তা নয়, ভারত আতিথেয়তা দেখাল বাঙ্গালোরে সিরিজ শুরু করে। মনে করে দেখুন অস্ট্রেলিয়াও কিন্তু গত বছরের শেষ দিকে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে একই ভুল করেছিল। বিশ্বের দ্রুততম ও বাউন্সি উইকেটে কোথায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে এনে ফেলবে, তা তো নয়ই, উল্টে পার্থে কোনও টেস্টই রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। রোটেশন পদ্ধতিতে টেস্টের কেন্দ্র বাছা নিয়ে আপত্তি নেই, কিন্তু তা বলে প্রথম টেস্ট বাঙ্গালোরেই কেন দিতে হবে? আর ঘরের মাঠে পছন্দের উইকেট পাবে না অধিনায়ক? এটা আবার কী ধরনের রাজনীতি! নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ! সবাই জানে, স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বল অস্ট্রেলিয়া। আমাদেরও প্রধান অস্ত্র স্পিন। কুম্বলের মতো চারশো উইকেট নেওয়া বোলার, হরভজনের মতো অফ স্পিনার যে কিনা তিন বছর আগে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল অস্ট্রেলিয়া ইনিংসে, তারা থাকতে কিনা নাগপুরে চাহিদামাফিক উইকেট মিলল না। কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল? না, ভারতীয় অধিনায়কের। ভাবতে পারেন পন্টিং বলছে সবুজ পিচ তৈরির আর তা অমান্য করে তুলে দেওয়া হচ্ছে ঘূর্ণি উইকেট? এটা কিন্তু কোথাও হয় না। ইংল্যান্ডের পিচে বল সিম করবে, অস্ট্রেলিয়ায় লাফাবে, উপমহাদেশে ঘুরবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কোনদিন শুনবেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে বল উপমহাদেশের মতো আচরণ করবে? তা ছাড়া সব দেশই তো নিজেদের শক্তি অনুযায়ী উইকেট তৈরি করবে। এখানে অন্যায়টা কোথায়? রাজনীতিই বা কেন টেনে আনা? যা-ই হোক, মুম্বইয়ের শেষ টেস্টে জিতে কিছুটা সম্মান ফিরেছে। অন্তত পক্ষে একটা ধাক্কা দেওয়া গেছে। সিরিজ জেতার পরও মাত্র ৯৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ অসিরা, প্রমাণিত ঘূর্ণি পিচ আর সূচিটা ঠিকঠাক থাকলে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এত সহজে জিততে পারত না সিরিজটা।

এখন প্রশ্ন, সাম্প্রতিক বিপর্যয় থেকে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। সুনীল গাভাসকারের পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান এর মধ্যে সব থেকে ইতিবাচক দিক। তবে কাজটা এক-দুদিনের নয়, দীর্ঘ সময় দাবি করে। কারণ মানসিকতার বদল এত সংক্ষিপ্ত সময়ে করা যায় না। সম্ভবও নয়। সুনীলের চিন্তাধারা, পরামর্শ, অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিয়মিত আদানপ্রদানে উপকৃত হবেই ব্যাটসম্যানরা। বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। পাঠানের উন্নতির চেষ্টা, ছন্দে ফিরতে মরিয়া জাহির, কুম্বলের জেদ, হরভজনের আগ্রাসী মানসিকতার সঙ্গে একজন বাঁহাতি স্পিনারকেও আমরা পেয়েছি, মুরলি কার্তিক। বোলিং নিয়ে খুব বেশি সমস্যা নেই। দীনেশ কার্তিকও অন্তত পার্থিবের চেয়ে অনেক ভাল। এবার ব্যাটসম্যানদের নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ভুলগুলো শুধরে নিতে হবে। এবং অতি অবশ্যই 'টিম ইন্ডিয়া'র সেই একজোট ভাবমূর্তিটা ধরে রাখতে হবে। আমি কিন্তু আশাবাদী।

পুরো নাম	► পার্থিব অজয় প্যাটেল
জন্মতারিখ	► ০৯-০৩-১৯৮৫
ফোন/ই-মেল	► গোপনই থাক ওগুলি
বাহন পোষ্য	► ফোর্ড আইকন/—
প্রিয়/আদর্শ খেলোয়াড়	► অ্যাডাম গিলক্রিস্ট/শচীন তেন্ডুলকার
প্রিয় অন্য খেলা	► টেবিল টেনিস
প্রিয়/আদর্শ অন্য তারকা	► —/টাইগার উডস
প্রিয় অধিনায়ক/কোচ	► সৌরভ গাঙ্গুলি/জন রাইট
সেরা ম্যাচ	► পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট, ২০০৪-এ
শ্রদ্ধেয় প্রতিদ্বন্দ্বী	► অস্ট্রেলিয়া
শ্রদ্ধেয় মানুষ	► শচীন তেন্ডুলকার
প্রিয় রাজনৈতিক নেতা	► কেউ নেই
প্রিয় অভিনেতা/অভিনেত্রী	► আমির খান/ঐশ্বর্য রাই
প্রিয় গায়ক/গায়িকা	► সোনু নিগম/—
প্রিয় রঙ/পোশাক	► নীল/ক্যাজুয়ালস
প্রিয় পশু/পাখি/ফুল	► বাঘ/—/—
প্রিয় খাদ্য/পানীয়	► থাই খাবার/জল
প্রিয় অবসর বিনোদন	► গান শোনা
প্রিয় ছুটি কাটানোর জায়গা	► লন্ডন
প্রিয় পত্রিকা/টিভি চ্যানেল	► স্পোর্টস স্টার/—
পছন্দ/অপছন্দ	► স্পষ্টবাদিতা/পিছনে কথা বলা
ঘৃণা/ভয়	► নেই/কাউকে নয়
গর্ব/হতাশা	► দেশের হয়ে খেলা/—
বন্ধু/শত্রু	► অনেকেই/আছে কিনা জানি না
প্রেরণা/ভালবাসা	► পরিবারের লোকরা/গোপনই থাক
সংস্কার	► তেমন কিছু নেই
স্বপ্ন	► বিশ্বের সেরা উইকেটরক্ষক হওয়া
ক্রীড়াবিদ না হলে	► অ্যাকাউন্টেন্ট হতাম
সই	► 



আপনি একমত?

১৫ ডিসেম্বর সংখ্যার বিষয়

ষষ্ঠী ও দীপঙ্করের ঘটনায় কলকাতার ফুটবলে প্রভাব পড়বে

চিঠি লিখবেন ১২০ শব্দের মধ্যে। খামের উপর লিখবেন — 'আপনি একমত?' আপনার নাম, ঠিকানাও যেন থাকে।

চিঠি পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর

'আজকাল' ও 'খেলা'-র কোনও কর্মী বা তাঁদের পরিবারের কেউ অংশ নিতে পারবেন না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয় ক্রিকেট স্বার্থেই বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল

স্বপক্ষে মতামত

১

পশ্চিমি ঝড়ে ইদানীং ভেঙে তছনছ হচ্ছিল প্রাচ্যের ক্রিকেট। লারার মতো 'মোস্ট ন্যাচারাল' ক্রিকেট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাডপ্যাচ যেমন কাটছিলই না, 'ক্লিক'ও করছিল না সে দেশের ক্রিকেট। একসময়ে ক্রিকেটের অনেক মণিমুক্তো যারা চয়ন করেছিল, ক্রিকেটের স্বার্থেই তাদের ঘুরে দাঁড়ানো কাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত ছিল। আই সি সি ট্রফি জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই আকাঙ্ক্ষারই বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। বেটার লেট দ্যান নেভার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করুক— মানুষের অন্তরে চির জাগরুক থাকুক ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট শিল্প।

অরূপ মণ্ডল। *গ্রাম ও পোঃ-খানো, জেলা-বর্ধমান।*

২

ক্রিকেটে আমাদের দেশের মতো স্পনসরশিপের আকাশছোঁয়া বাজার নেই। তা ছাড়া ওদেশের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ক্রিকেটারদের ম্যাচ পিছু অর্থও কম দেয়। গ্রেডেশন প্রথা চালু হওয়ার কথা তো ও দেশের ক্রিকেটাররা ভাবতেই পারেন না। বিগত ২৫ বৎসর ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জিততে পারেনি। মাঝে মাঝে লারা, চন্দ্রপাল, সারওয়ানদের ব্যক্তিগত দক্ষতার ফলে কিছু কিছু ম্যাচ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ক্রিকেট হল দলগত খেলা। সব সময় এঁরা (লারা, চন্দ্রপাল, সারওয়ান) ম্যাচ জেতাবেন তা তো সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন পর দেখা গেল নামজাদা খেলোয়াড়রা অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও নিচের দিকের খেলোয়াড় ব্র্যাউশ এবং ব্রাউন ম্যাচ জেতালেন। অনেকদিন পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং গভীরতা দেখা গেল। বোঝা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার বিশ্ব ক্রিকেটে দারুণভাবে উঠে আসছে। এই জয় ক্রিকেটের স্বার্থে খুবই জরুরি ছিল। তবে ও দেশের ক্রিকেট প্রশাসকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং বিজ্ঞাপনদাতাদেরও ক্রিকেটের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

অতনু দাশগুপ্ত। *পিয়ালী ভবন, পোঃ-নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর।*

৩

টেস্ট ক্রিকেটে বহু রেকর্ডধারী ব্রায়ান লারার নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতেই ক্রিকেটে আবার ক্যালিপসো সঙ্গীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হচ্ছে। ক্রিকেটের স্বার্থেই গেইল, ব্রাউন, চন্দ্রপাল, সারওয়ান, পাওয়েলদের দুর্দান্ত পারফরমেন্স জরুরি ছিল। ক্রিকেটে যখন ফিল্মস্টার, কোটিপতি ব্যবসায়ী, বিজ্ঞাপন-বিনোদনের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আই সি সি ট্রফিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় আবার তাদের ক্রিকেট দুনিয়া শাসনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সাফল্য বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রাতেও নতুন অক্সিজেন জোগাবে।

পিনাকী কিঙ্কর নন্দী। ৬ এ,, *নর্দার্ন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৩৭*

৪

ব্রায়ান লারা ও কোর্টনি ওয়ালশের কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বরেকর্ড ক্যারিবিয়ান তথা বিশ্ব ক্রিকেটকে গর্বিত করলেও তাঁদের দলগত সাফল্যের হার ছিল হতাশাজনক। এর ফলে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক রকম হ্রাস পায় এবং সৃষ্টি হয় এক গভীর শূন্যতা। এই মধুর জয়ে ক্যারিবিয়ানরা আগামী দিনে অনুপ্রাণিত ক্রিকেট উপহার দিয়ে পুনরুদ্ধার করবেন তাঁদের সোনালি অতীত এবং ক্রিকেটের সবুজ গালিচায় ক্যালিপসো সুর মূর্ছনা সমগ্র বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীদের আবার মুগ্ধ করবে।

অমিতকুমার কর। *মতিলালপাড়া, জয়নগর, মজিলপুর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা*

৫

ক্যারিবিয়ানদের খেলায় যে ক্যালিপসো সুর পাওয়া যায় তা আর কোনও দলের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই ক্রিকেটের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল ক্যারিবিয়ানদের জয়। এবারের আই সি সি ট্রফিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনবদ্য ক্রিকেট উপহার দিল। অস্ট্রেলিয়া জিতছে ঠিকই, কিন্তু সেভাবে আনন্দ দিতে পারে না। যা পাওয়া যায় ক্যারিবিয়ানদের খেলায়। এই জয় তো বিশেষভাবেই জরুরি ছিল, না হলে ক্রিকেট শ্বেতাঙ্গদেরই দখলে চলে যেত।

সুদীপ্ত ব্যানার্জি। *বড়বাগান, সিউড়ি, বীরভূম।*

৬

একদা ক্রিকেট দুনিয়াকে যারা শাসন করত বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে তাদের সেই শাসন করার ক্ষমতা প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল। যারা এক সময় ফেবারিট দল হিসেবে চিহ্নিত হত, গত দেড় দশকে তাদের সেই তকমা হাতছাড়া করে বসেছিল। ফলে, ক্রিকেটের প্রতি ক্যারিবিয়ানদের বর্তমান-প্রজন্ম সেইভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিল না। তাই, এবারের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের নবজাগরণের সূচনা করল বলা যায়। অন্যদিকে, ক্যারিবিয়ানদের এই জয় আই সি সি-এর স্বার্থের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। কেন না, আগামী ২০০৭ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জেই। এই জয় দর্শকদের ক্রিকেট মাঠের পুনঃআকৃষ্ট হবে।

বাদল পাল। *ধর্মনগর, ত্রিপুরা উত্তর*

৭

'History repeats ifself' ওয়েস্ট ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয় যেন এই একই ভাবনার সিলমোহরীয় ছাপ। আমরা যারা ক্রিকেটীয় অনুভবে ঋদ্ধ, ক্রিকেটকে রক্তের হিমোগ্লোবিনের মতো ভালবাসি, রাঁধুনির হাতের হলুদের গন্ধ, বর্ণের মতো বুকের গভীরে ক্রিকেটকে তার রূপ,

রস, গন্ধবর্ণসহ অনুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখতে চাই, তারা অবশ্যই জানে ক্রিকেট দুনিয়ায় একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের গরিমা কতখানি দেদীপ্যমান ছিল। আগুনের মহিমায় যে দাবানল গগনস্পর্শী উচ্চতায় লেলিহান, জানি না তার প্রদীপ শিখা হতে ভাল লাগে কিনা, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামক ক্রিকেটাগ্নি-গর্বী দুরন্ত দাবানলকে স্তিমিত হতে হতে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু রঙ্গমশালে পরিণত হতে দেখে মধ্যরাতের স্বপ্নে শোনা নূপুরের শব্দের মতো মনের অবচেতনে ব্যথার কম্পন অনুভূত হয়ে চলছিল। বুকের হাপর ছোড়াস্থলিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে শুধুই মর্মবেদনার হাহুতাশন। এই কি সেই রত্নগর্ভ প্রসাধনী ওয়েস্ট ইন্ডিজ! এই কি সেই ওরেল, ওয়ালকট, উইকস, সোবার্স, কানহাই, লয়েড, রিচার্ডস, রবার্টস, গিবস-এর দেশ! গলদা চিংড়ির ভেড়ি যখন নিরীহ চারাপোনার পুকুর হয়ে যায় তখন জলে তো বিলাপের বুদবুদ কাটতেই থাকে। কিন্তু সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজই আবার ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছে। এ তো সেই ক্রিকেটীয় মহিমারই বিশ্বায়ন। আই সি সি ট্রফি জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই শিক্ষাই দিয়ে গেল এখন আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালের মটকায় শুধু অস্ট্রেলিয়ারই ঈগল পাখি হয়ে দাপাদাপি করার অধিকার নেই। সেই চালে ভারত, ইংল্যান্ড এবং সর্বোপরি ওয়েস্ট ইন্ডিজও যথাক্রমে বাজ, চিল, প্যালকন পাখি হয়ে উড়ে এসেছে। বিশ্বক্রিকেটের লড়াইয়ের আকাশটা এবার সত্যি মাধুর্যময় হয়ে উঠবে।

প্রবীর হালদার। *লক্ষ্মীপুর, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক: ৭৪৩২৫২*

৮

এই জয়ের ফলে আই সি সি এর মূল লক্ষ্য 'ক্রিকেটের বিকাশ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি'ও সাধিত হবে। কেন না পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এই জয় থেকে শিক্ষা নেবে যে কীভাবে ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে জাতীয় সমস্যা নিরসন করা যায়। অনেক কালো চামড়ার দেশে শ্বেতাঙ্গদের মনে ক্রিকেটের প্রতি একটি অনীহার ভাব এসেছিল। কেন না গত দুই দশক ধরে বিশ্বক্রিকেটে ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্যারিবিয়ান দলের প্রদর্শন হতাশজনক। এহেন মুহূর্তে এই জয় আবার এই বিরূপ মনোভাবাপন্ন ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করল এবং সজাগ করে দিল যে, রিচার্ডস, মার্শাল, ওয়ালশ, হোল্ডিংদের উত্তরসূরিদের দিন ফুরিয়ে যায়নি। তাই এই জয় ক্রিকেটকে বিশ্বজনীন করে তুলতে সহায়ক হবে।

নজমুল হুসেন লস্কর। *অধ্যাপক, ফ্রন্টিয়ার কলেজ, আর কে মিশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১০*

৯

'ফুটবল ও ব্রাজিল' এবং 'ক্রিকেট ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ' — এক জোড়া এই যুগ্ম শব্দ ক্রীড়াপ্রেমীর সচেতন হৃদয়ে আজও অনুরণিত হয়। অনুরণনের সেই বাতাবরণে যৌক্তিকতারই কোমল পরশ অদ্ভুত এক ধরনের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। অসাধারণ প্রতিভা, ক্রিকেটীয় বহিঃপ্রকাশ, সর্বোপরি খেলার আনন্দে খেলায় মেতে ওঠা — ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট অভিধানের অপরিহার্য উপাদান! বেশ চলছিল — তারপর কোথায় যেন কি হয়ে গেল! এক ঝাঁক বিস্ময়কর ক্রিকেটারের অবসর গ্রহণের চাপে সুরেলো ক্যালিপসো সঙ্গীত ছন্দহীন হয়ে গেল। বিশ্ব-ক্রিকেট আঙিনা যেন তার নিজস্ব কৌলীন্যকে হারিয়ে বিবর্ণতার আতিশয্যে অসহায় হয়ে পড়ল! এককভাবে ব্রায়ান চার্লস লারা ক্রিকেটাকাশে চোখ ধাঁধানো আলো বিকিরণ করলেও দলগতভাবে ক্রিকেটপ্রেমীর সংবেদনশীল অন্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অপাঙক্তেয় ছিল! ক্রিকেট-ক্ষুধা কিছুতেই মিটছিল না! এক ধরনের অপরিপূর্ণতা আমাদের গ্রাস করছিল! সেক্ষেত্রে সেই ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়লাভের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয়। সরল-মনা কালো মানুষদের বিজয়োল্লাসে কেঁপে উঠুক ক্রিকেট জগৎ!

বিশ্বজিৎ কর। *সুভাষপল্লী, খড়্গপুর-১*

১০

মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের খেলা ক্রিকেট, কিন্তু অতীতের কয়েকটি বিশ্ব কাঁপানো দলের অবস্থা সঙ্গীন। তাদের পারফরমেন্সের নিম্নগামিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে সব দেশের ক্রিকেটপ্রেমীর সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। নতুন প্রজন্ম আগ্রহ হারাচ্ছে ক্রিকেটে, আগ্রহী হচ্ছে অন্যান্য খেলায়। যা ক্রিকেটের পক্ষে অশুভ। ক্রিকেটার বা ক্রিকেটপ্রেমীরা এমনিতেই বিশ্বে সংখ্যালঘু, তারপর যদি তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায় তাহলে তা কিছুতেই ভাল হতে পারে না। কারণ 'ক্রিকেটের বিশ্বায়ন' শব্দটি এখনও 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'র মতো শোনায়। আর এ কাজ যথেষ্ট কঠিনও, তার জ্বলন্ত প্রমাণ বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পরের ঘটনাবলি। ক্রিকেট যদি ফুটবলের মতো বিশ্বজনীন হত তাহলে দু-একটি দেশে ক্রিকেট বিলুপ্ত হলেও কিছু হত না। কিন্তু মাত্র সাত-আটটি দেশের মধ্যে এক-দুটো কমে গেলে ক্ষতিটা হত মারাত্মক। ওঃ ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয় ও ইংল্যান্ডের পুনরুত্থান সে দেশের জনগণকে ক্রিকেট সম্বন্ধে নতুন করে ভাবাবে, উৎসাহিত করবে নতুন করে ভালবাসতে। আর বিশ্বের তথাকথিত সেরা দলগুলিকে চাপে ফেলবে, চাপে রাখবে সে দেশগুলির দেব-সদৃশ মহাতারকাদের। তাঁরাও বাধ্য হবে তাদের পারফরমেন্সের উন্নতিতে একশো শতাংশ দিতে। ফলে বাড়বে প্রতিযোগিতা, সমৃদ্ধ হবে ক্রিকেট।

সুবীর কুমার গোপ। *রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম, ৭২১৫০৭।*

নির্বাচিত সেরা মত

১১

১৯৭৯ সালে শেষ বিশ্বকাপ জয়। ১৯৮৩-তে পতন। তারপর অবক্ষয়। ফলে দেশের মানুষের আস্থা হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তরুণ সমাজ ধীরে ধীরে ক্রিকেট থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। বহুদিন শুধু অস্ট্রেলিয়া আর অস্ট্রেলিয়া। বড় একঘেয়েমি হয়ে গিয়েছিল। সেই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া গেল এই জয়ে। মরা গাঙে আবার জোয়ার আসার সম্ভাবনা থাকছে, ভস্মস্তূপ থেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই জয় আবার এই দেশের মানুষকে, তরুণ সমাজকে ক্রিকেটমুখী করবে।

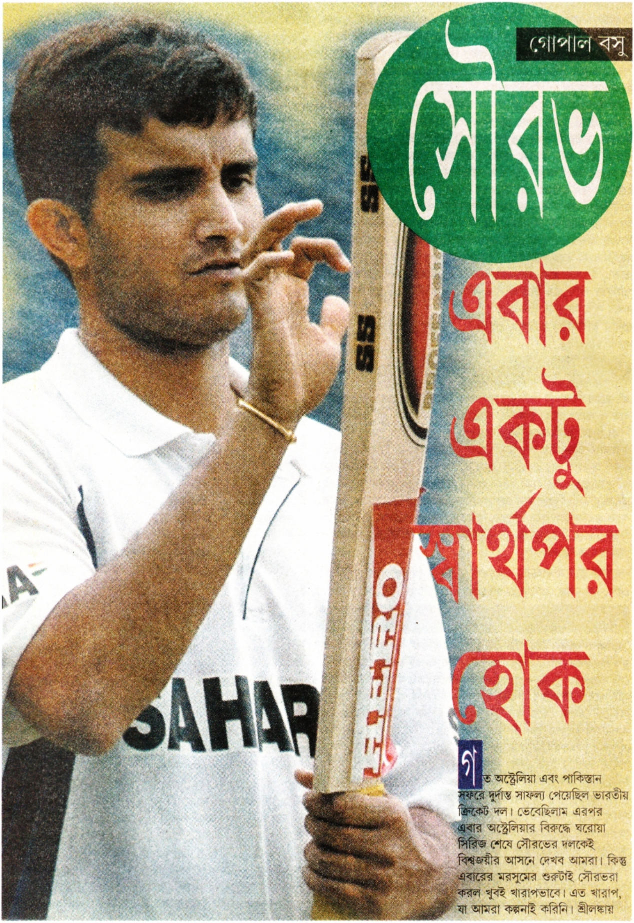
আশা করা যায়, বিশ্ব ক্রিকেটের প্রতিযোগিতা আবার ক্ষুরধার হবে। সর্বোপরি, এবার বিশ্বকাপের আয়োজন করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সে কারণে এই জয়ের প্রয়োজন ছিল।

সুস্মিতা প্রামাণিক। *শিক্ষিকা, মাজু আর এন বসু হাইস্কুল।*

বিপক্ষে মতামত

১

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয় ক্রিকেটের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল মানতে পারছি না। আপাতদৃষ্টিতে ২০০৭-এর বিশ্বকাপ ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে ভেবে হ্যাঁ বলবেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। সেটা হল এই উপমহাদেশের বাইরে যখন ক্রিকেট হয় তখন কতজন মাঠে থাকেন তার কোনও পরিসংখ্যান রাখা হয় না। হলে দেখা যেত ক্রিকেটের বিশ্বায়নের নামে বিভিন্ন দেশে যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে তাতে করে আর্থিকভাবে সংগঠক দেশ ও আই সি সি ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। এই উপমহাদেশের দলগুলির মধ্যে খেলা থাকলে তবু মাঠে ভিড় হয় অর্থাৎ দর্শকের একটা বড় অংশ উপমহাদেশের লোক। ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ফাইনাল তবু গ্যালারি ভরেনি। কোনও কোনওদিন তো মনে হয়েছে বুঝি পাড়ার ক্রিকেট হচ্ছে। সুতরাং এই উপমহাদেশের বাইরের টিম যখন থাকছে তখন ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। আবার আর্থিকভাবে ক্ষতি মানে সমূহ ক্ষতি। কাজেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের আই সি সি ট্রফি জয় ক্রিকেটের কোন স্বার্থ রক্ষা করল? কিছুই না। **সাধন পরামানিক।** *পুরুলিয়া*



গোপাল বসু

সৌরভ এবার একটু স্বার্থপর হোক

গত অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তান সফরে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভেবেছিলাম এরপর এবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরোয়া সিরিজ শেষে সৌরভের দলকেই বিশ্বজয়ীর আসনে দেখব আমরা। কিন্তু এবারের মরসুমের শুরুটাই সৌরভরা করল খুবই খারাপভাবে। এত খারাপ, যা আমরা কল্পনাই করিনি। শ্রীলঙ্কায়

এশিয়া কাপের পর হল্যান্ডে একদিনের ত্রিদেশীয় সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ। তবু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির আগে মনে হয়েছিল এবার নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবে ভারতীয়রা। কিন্তু ন্যাটওয়েস্টে তো নয়ই, এমনকি তারপরের আই সি সি ট্রফিতেও আবার ব্যর্থ হল ওরা। আমাদের আশার বেলুনটা চুপসে যেতে শুরু করেছিল এরপরই। ব্যাটসম্যানরা সহজাত ছন্দে নেই, বোলাররা সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। এই পরিস্থিতিতে নাগপুর টেস্টে এসে আমাদের সব আশাই শেষ হয়ে গেল। ৩৫ বছর পর ভারতের মাটিতে এসে টেস্ট সিরিজ অস্ট্রেলীয়রা জিতে নিল ওখানেই। হ্যাঁ, নাগপুরের উইকেটটা অস্ট্রেলিয়ার মতোই ঘাসের ছিল। তবে চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টের শেষদিনের খেলাটা হলে হয়ত এই সিরিজের ফলটা অন্যরকম হতেও পারত। অন্তত ওরকম বিশ্রীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ত না ভারতীয় দলটা। আসলে চেন্নাইয়ে বৃষ্টির জন্য শেষদিনের খেলা না হওয়ায় ভারতীয়দের মনোবল তলানিতে চলে গিয়েছিল। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে উঠেছিল নাগপুরের ঘাসের উইকেটটা। তবে বলতে দ্বিধা নেই ভারতীয়দের ওরকম অসহায় আত্মসমর্পণ দেখে আরও অনেকের মতোই বিস্মিত হয়েছিলাম আমিও। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এর চেয়েও বেশি ঘাসে মোড়া উইকেটে খেলেছে সৌরভের দল। সাফল্যও পেয়েছে।



এরপর নাগপুরের ঘাসের উইকেটে ওদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় সবাই হতাশ তো হবেনই। তবে এখানে একটা মনে রাখতে হবে আমাদের। সেটা হল বিদেশে আমাদের ঘাসের উইকেটে খেলতে হবে, এটা প্রত্যাশিতই থাকে। সে জন্য মানসিকভাবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা তৈরিও থাকে। কিন্তু নাগপুরের উইকেটেও ওরকম ঘাস থাকবে, সেটা ছিল ওদের ধারণার বাইরে। তা ছাড়া স্পিন বোলিংটা অস্ট্রেলীয়রা তেমন ভাল খেলে না। এই অবস্থায় স্পিন সহায়ক না হলেও ঘাসহীন উইকেটই প্রত্যাশিত ছিল নাগপুরে। কিন্তু শশাঙ্ক মনোহর করলেন ঠিক উল্টোটাই। ঘাসে মোড়া একটা পিচ বানালেন। যেটা প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই কাজ করেছিল ভারতীয় শিবিরে। এর সঙ্গে যোগ করুন টেস্ট শুরুর আগে ভারত অধিনায়ক সৌরভের সঙ্গে শশাঙ্ক মনোহরের সেই চরম দুর্ব্যবহার। উদ্বিগ্ন সৌরভ যখন উইকেটের ঘাস ছেঁটে ফেলার জন্য অনুরোধ করল, সরাসরি তার মুখের ওপর না বলে দিলেন শশাঙ্ক। ভারতীয় অধিনায়কের ওরকম দুর্ব্যবহার ভাবা যায়? আসলে বোর্ডের রাজনীতিটা এখানে টেনে এনেছিলেন শশাঙ্ক। অধিনায়ক সৌরভের মান রাখতে একটু অন্যরকমভাবেও ওই কাজটা করতে পারতেন। কিন্তু সে পথে হাঁটলেনই না শশাঙ্ক। বরং চরম অপমান করলেন সৌরভকে। এ বোধহয় শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। পাঠক চিনে রাখুন, এঁরাই হলেন আমাদের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা। পথেঘাটে অচেনা লোকের সঙ্গে মতপার্থক্য বা ঝগড়া সময়ই হতে পারে। নানারকম দুর্ব্যবহারও পেতে হতে পারে আমাদের। কিন্তু ঘরের অতি চেনা লোকের কাছ থেকে ওরকম দুর্ব্যবহার পেলে মানসিক আঘাতটা বেশিই হয়। শশাঙ্ক অধিনায়ক সৌরভকে সেদিন ওভাবে অপমান করায় ভারতীয় শিবিরও প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল। নাগপুরে টেস্টে সেটা আর ওরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হ্যাঁ, নাটকীয়ভাবে মুম্বই টেস্ট জিতে হারানো সেই মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে ভারতীয়রা। কিন্তু এখন নয়, এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় আসছি পরে। তার আগে বরং খতিয়ে দেখা যাক সাফল্যের চূড়া থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হঠাৎ এ রকম পতন হল কেন? গত চারটি একদিনের সিরিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হারের পর সাধারণ ক্রিকেট অনুরাগীদের মুখে মুখে এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরছে। কারণটাও খুবই সঙ্গত। ভারতীয় ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের এত রমরমাও তো ওঁরা আছেন বলেই। এবার মূল প্রসঙ্গে ঢুকি। আমাদের বোর্ড এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সংস্থা। আমাদের দলে এখন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান শচীন তেন্ডুলকার আছে। আছে গতবার বর্ষসেরা ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড় এবং সেরা প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার ইরফান পাঠানও। এরসঙ্গে যোগ করুন সৌরভের মতো দুরন্ত অধিনায়ককে। তা হলে দল হঠাৎ এত খারাপ খেলবে কেন? ডালপালা দেখে লাভ নেই, এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে একদম শিকড়ে। মনে আছে, শ্রীলঙ্কার এশিয়া কাপের আগে চেন্নাইয়ে যখন ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির চলছে, তখন জিওফ্রে বয়কট ছোট অথচ খুব দামি একটা কথা বলেছিলেন, 'জিম ফিট না হয়ে তোমার ম্যাচফিট হও।' আসলে বয়কটের অভিজ্ঞ চোখে তখনই গলদটা ধরা পড়েছিল। এক ঝলক দেখেই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনার বুঝে ফেলেছিলেন যে, নেটে ভারতীয়দের অনুশীলনটা ঠিকমতো হচ্ছে না। অসতর্কতার সুযোগে ওদের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে এমন কিছু ভুলভ্রান্তি ঢুকে পড়ছিল যেটা কোচ খেয়ালই করেননি। বরং কোচ, কর্মকর্তারা সবাই তখন বলছিলেন নেটে চমৎকার অনুশীলন

হচ্ছে [illegible] ঘটছে। সুতরাং সব ঠিকই আছে। ওঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, অনুশীলনে যে রকম ব্যাটিং বা বোলিং করে ম্যাচেও তারই প্রতিফলন ঘটে। অনুশীলনে ভুলভ্রান্তি থাকলে ম্যাচে সেগুলি হবেই। কারণ অনুশীলনটাই আসল, ম্যাচটা হচ্ছে তার জেরক্স। আরও স্পষ্ট বললে জাম গাছ পুঁতলে তাতে আম নয়, জামই ফলে। আর সেই ভুলের মাসুলই আমাদের দিতে হল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে। তার ওপর ছিল ক্রিকেটারদের চোট-আঘাত। পুরো শক্তি নিয়ে ভারত শেষ কবে খেলেছে বলুন তো? মনে আছে আপনাদের? হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের ফিজিও অ্যান্ড্রু লিপাসের যেমন দোষ আছে, তেমনি দোষী আমাদের বোর্ডকর্তারাও। আলি ইরানির থেকে শুরু করে এরমধ্যে ভারতীয় দলের জন্য যে কয়েকজন ফিজিওকে আনা হয়েছে তার মধ্যে সেরা ছিলেন অ্যান্ড্রিয়ান লেরুই। কিন্তু আমাদের বোর্ডকর্তারা তাঁকে ধরে রাখার জন্য বাড়তি কোনও উদ্যোগই নিলেন না। শোনা যায়, শেষ কয়েক মাসের মাইনেও নাকি তাঁকে দেওয়া হয়নি। এরপর লেরু যখন নিজের দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার বিমান ধরতে যাচ্ছেন, আমাদের বোর্ডকর্তারা তখন কলকাতায় স্পিন বোলিং নিয়ে লোকদেখানো একটা আলোচনাচক্র নিয়ে ব্যস্ত। অথচ লেরু



থাকলে, আমি নিশ্চিত ভারতীয় ক্রিকেটারদের চোট-আঘাত এত বেড়ে যেত না কিছুতেই। লিপাস যে নিজের কাজটা ঠিকমতো করতে পারে না, সেটা এখন প্রমাণিত। অথচ ফুটবলের স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের মতো অযোগ্য জেনেও লিপাসকে বছরের পর বছর ফিজিও হিসেবে রেখে দিয়েছেন আমাদের ক্রিকেটকর্তারা। ওঁদের গলদটাও সেখানেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে এখন আমাদের করণীয় কী? দুটি পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি এখনই। একটা অল্প মেয়াদি, আর একটা দীর্ঘ মেয়াদি। অল্প মেয়াদি পরিকল্পনাটা হল ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের এখনই ভালমতো একটা ঝাঁকুনি দিতে হবে। যাতে কিছু মরা ডালপালা খসে পড়ে। ভারতের টুপিটা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এ কথাটা এবার ক্রিকেটারদের সবাইকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বলা দরকার, নাম নয়, পারফরমেন্সই দলে থাকার প্রধান শর্ত। আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাটা হল, আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট পরিকাঠামোটাকে একেবারে ঢেলে সাজানো। প্রথমেই অনুমোদিত সব রাজ্য সংস্থা বোর্ড নির্দেশ দিক, নাগপুরের মতো ঘাসের উইকেট বানাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাগপুর যদি ওরকম প্রাণবন্ত উইকেট বানাতে পারে তা হলে অন্যরাও পারবে। এরপর আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে দেশের তারকা ক্রিকেটাররা সবাই ঘরোয়া রনজি এবং দলীপ ট্রফিতে খেলতে পারে নিয়মিতভাবে। কারণ ঘরোয়া ক্রিকেটটা যদি নেট অনুশীলন হয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তা হলে ম্যাচ সুতরাং অস্ট্রেলীয়দের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেই হবে আমাদেরও। ভুললে চলবে না, নতুন প্রতিভাদের তুলে আমার সেরা পথ এটাই। কিন্তু আমাদের বোর্ডকর্তারা কি সেটা করবেন? তেমন পয়সার আমদানি নেই বলেই ওঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটকে আমাদের বোর্ডকর্তারা তেমন গুরুত্ব দেন না। অবশ্য দেবেনই বা কী করে? বোর্ডে কোনও ক্রিকেটার নেই যে! তবে আর না, এবার কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। ক্রিকেটকর্তারা মনে রাখুন, বোর্ডটা স্রেফ মোটা টাকা রোজগারের জন্য নয়। দেশের ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ দেখাই বোর্ডের আসল কাজ। এবার থেকে কিন্তু সেটাই ওঁদের করতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের অধিনায়ক সৌরভও যথেষ্ট চাপে আছে। আমার মতে, এবার ওর একটু স্বার্থপর হওয়ার সময় এসেছে। সবাই জানেন, এই 'টিম ইন্ডিয়াকে' নিজের মতো গড়েছে তিল তিল করে। আর এ ক্ষেত্রে কারও সঙ্গেই কোনওরকম আপস করেনি। বরং অনেকের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই দলটাকে বানিয়েছে নিজের মনের মতো করে। আর সেটা করতে গিয়েই এতদিন নিজের ব্যাটিংয়ের দিকে সেভাবে মন বা নজর দিতে পারেনি। কিন্তু আর নয়, এবার সৌরভ একটু নিজের দিকে তাকাক, মন দিক নিজের ব্যাটিংয়ে। বড় রান পেলে ব্যাটসম্যান হিসেবে আত্মবিশ্বাস তো বাড়বেই, অধিনায়ক হিসেবেও বাড়তি সুবিধা হবে ওর। একটা দলের আত্মবিশ্বাসও বহুগুণে বেড়ে যাবে সে ক্ষেত্রে। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে তো আমরা তার প্রমাণও পেয়েছি। ব্রিসবেনে চাপের মুখে ওর দুরন্ত সেই ১৪৪ রানের ইনিংসটাই কিন্তু গোটা দলের আত্মবিশ্বাসকে তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল সেবার। এবার আমরা ফিরে আসব মুম্বইয়ের চতুর্থ এবং শেষ টেস্টের কথায়। ওয়াংখেড়েতে জিতে ভারত হারের ব্যবধান কিছুটা কমালেও ওখানকার পিচ নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। হওয়ারই কথা। দুদিনের চেয়ে সামান্য বেশি সময়ে একটা টেস্ট শেষ হয়ে গেলে সেই ম্যাচের পিচ নিয়ে নানা কথা তো উঠবেই। ক্রিকেট নয়, সব খেলাতেই এখন বড় ভূমিকা থাকে স্পনসর বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির। পাঁচ দিনের জন্য মোটা টাকা দিয়ে মাত্র দুদিনের টিভি প্রচার পাওয়াটা ওরা কিন্তু মেনে নেবে না কিছুতেই। এর ওপর আছেন দর্শকরা। প্রায় আকাশছোঁয়া দামে পাঁচ দিনের ম্যাচের টিকিট কিনে ওঁরাই বা মাত্র দুদিন খেলা দেখবেন কেন? না, এটাও মানা যায় না। এ রকম চলতে থাকলে কিন্তু স্পনসরদের মতো দর্শকরাও ক্রিকেটের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও বলছি, মুম্বইয়ের মতো একটা জয়ই ভারতীয় দলে খুব দরকার ছিল। কারণ নাগপুরের বিপর্যয় ভারতীয় ক্রিকেটকে প্রায় মৃত্যুশয্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। এরপর মুম্বইয়েও হারলে ভারতীয় ক্রিকেটকে শেষকৃত্যের জন্য শ্মশানে নিয়ে যেতে হত আমাদের। অনেকে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলতে পারেন এখানে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বিচারটা কিন্তু হয় পরিস্থিতির ওপর। ঠান্ডা মাথায় কাউকে খুন করা আর আত্মরক্ষার্থে কাউকে মেরে ফেলা— অপরাধ দুটোই কিন্তু সমান নয়। একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে কেউ খাবার দিলে সে কি কখনও দেখে যে খাবারটা কে দিল, কীভাবে দিল? বরং হাতে খাবার পাওয়ার পরই গোগ্রাসে তা খেতে থাকে। মুম্বইয়ে ভারতীয় দলের অবস্থাও ছিল ঠিক সেরকমই। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে আর ওরকম দুরবস্থায় যাতে পড়তে না হয়, ক্ষুধার্ত মানুষটির যেমন সেকথা ভেবে সাবধান হওয়া উচিত, তেমনি ভারতীয় বোর্ডও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সতর্ক হোক এখনই। দেখুক, এ রকম খারাপ পরিস্থিতিতে যেন ভারতীয় দলকে আর পড়তে না হয়। যখন বাঁচার জন্য আবার সেই মুম্বইয়ের মতো ঘূর্ণি পিচই বানাতে হচ্ছে আমাদের। এই শিক্ষাটা মনে থাকলেই যথেষ্ট। সামনের সিরিজগুলিতে তা হলে আর এ রকম সমস্যায় পড়তে হবে না আমাদের।

বলতে পারেন ?

২৪

'বলতে পারেন ?'

১ টেস্ট-ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া দলের সব চেয়ে কম রানের ইনিংস কত ?
২ কোন বিশ্ববিখ্যাত বোলারের ডাকনাম ছিল 'ফার্গি' (fergie) ?
৩ ইংরেজরা এক বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক অ্যাথলেটিক্সের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় ?
৪ ১৯৩২-এর লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কোন দেশ ?
৫ তাঁর ক্রিশ্চিয়ান নাম ছিল রবার্ট ফ্রেডেরিক, কিন্তু এই বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার অন্য নামেই বেশি পরিচিত। সেই নামটা ?
৬ কোন ফুটবলারের একটা নাম— কালার্ড ফ্যালকাও ?
৭ অলিম্পিকে প্রথম সোনাজয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কের নাম ?
৮ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কবে ?
৯ বিশ্বকাপ ফুটবলের ১০০০তম গোলটি কে করেছিলেন ?
১০ সুবিখ্যাত জুভেন্টাস ক্লাবের ঠিকানা ইতালির কোন শহর ?

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ২২নং বলতে পারেন-এর উত্তর এসেছে খুবই কম। দুঃখজনক ঘটনা হল, একজনও সঠিক উত্তর পাঠাতে পারেননি।

অচ

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর ২২

১ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়
২ ডালে টমসন
৩ রজার মিল্লা
৪ ডার্বিশায়ার
৫ ইংল্যান্ডের কাউন্টিগুলোর মধ্যে খেলা হওয়া 'দ্য জিলেট কাপ' (১৯৬৩)
৬ গোলের ৭ গজ দূর থেকে। পেনাল্টি স্ট্রোকে পুশ ফ্লিক করে গোল করতে হবে। হিট করার নিয়ম নেই।
৭ অ্যালফ্রেডো ডি স্টিফানো
৮ ট্রেডস কাপ, শুরু হয়েছিল ১৮৮৯-তে।
৯ রয়াল আইরিশ রাইফেলস (১৯০১ সালে) ভারতীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৭২-এ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।
১০ ডাগ ওয়াল্টার্স।

হয়ত জানেন ১৮

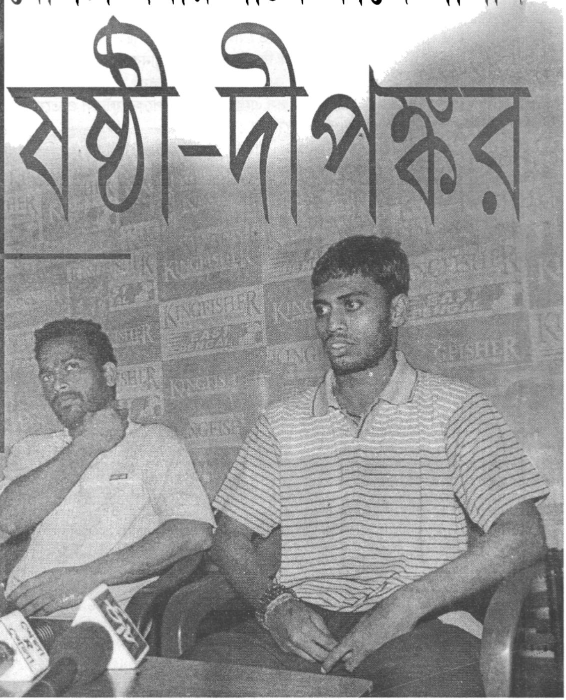
মারাদোনার মন্তব্য

গভীর বেদনা ও হতাশায় মহানায়কদের মুখ থেকেও কখনও কখনও এমন মন্তব্য বেরিয়ে আসে যার জন্য শ্রোতাদের কোনও মানসিক প্রস্তুতি থাকে না। পশ্চিম জার্মানি দলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার সময় বিতর্কিত পেনাল্টি দেওয়া হয় মারাদোনার দল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। শোকগ্রস্ত মারাদোনা সেই ম্যাচের পর বলেছিলেন— 'আমার মেয়েকে বলতে হবে এখন এমন পরিস্থিতি এসেছে যে ফুটবলের মধ্যেও মাফিয়া আছে'। আর্জেন্টিনা সেই ফাইনালে (১৯৯০) হেরেছিল সেই বিতর্কিত পেনাল্টিতেই।

অচ

সুযোগটা এবার সঠিক কাজে লাগান ষষ্ঠী-দীপঙ্কর

পার্থ রুদ্র



তিন বাঁদরের মূর্তিটা দেখেনি এমন কাউকে পাওয়া খুব কঠিন। খারাপ কথা বলব না, খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কিছু শুনব না, এরই প্রতীক। মানুষের মধ্যে যে সব প্রবৃত্তি আছে তার মধ্যে ভাল দিকটাও যেমন আছে, তেমনি আছে অন্যায়ের প্রবণতাও। শিক্ষা, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে আচরণ তৈরি হয় যে কোনও মানুষের। আর তাই ওই তিন বাঁদরের মূর্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

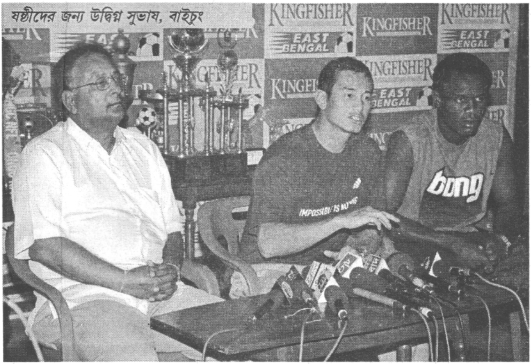
ষষ্ঠী দুলে, দীপঙ্কর রায়ের বর্তমান সামাজিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার এঁরা, ইস্টবেঙ্গলের অগণিত সমর্থকের ভরসার কারণ। এই দুজন গোটা ফুটবল মহলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করে অন্য এক চেহারায় প্রকাশিত হলেন। রাজ্যের কুখ্যাত গুন্ডা, যে ছিল বেশ কিছু খুনের— অরাজকতার দায় নিয়ে ফেরার, তাকে পাওয়া গেল ষষ্ঠী দুলের বাড়িতে। বলা ভাল পুলিস নানা সূত্র থেকে খবর পেয়ে 'হাতকাটা দিলীপ' হিসেবে বেশি করে পরিচিত সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করল ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডারটির বাড়ি থেকে। অপ্রত্যাশিত খবর, তাই চমকে উঠেছিল ফুটবল সমাজ। নানাভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন বিভিন্ন ফুটবলমনস্ক মানুষরা। প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে কেউ কেউ চিৎকার করেছিলেন 'লজ্জা, লজ্জা' বলে। কেউ কেউ

আবার 'একি শুনছি, এ রকম হতে পারে নাকি' বলে চমকে উঠেছিলেন। আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা জল কোনদিকে গড়ায় বুঝে নিতে নিঃশব্দে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ঘটনার প্রাথমিক প্রভাব কেটে যাওয়া মাত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ সুভাষ ভৌমিক এবং লাল-হলুদ কর্তারা। সব কর্তা নন। আপত্তি ছিল বেশ কয়েকজনের। তাঁদের যুক্তি ছিল, ফুটবলার বলে বেআইনি কাজ করার অধিকার জন্মায় নাকি? কিন্তু যাঁরা মনে করেছিলেন যে এ রকম বিপদের সময়েই পাশে দাঁড়াতে হয় তাঁদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি কারও। বরং পাশে দাঁড়ান মানসিকতার কর্তারাই বাকি সবাইকে এমন বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন যে হ্যাঁ, বিপদেই তো পাশে দাঁড়াব। এবং



করেছিলেন। পেনাল্টি অনুশীলনে ষষ্ঠীর গোল করার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনকি যেদিন এমন সাড়াজাগানো ঘটনা ঘটেছিল তার ঠিক আগের দিন কোচ এবং বেশ কিছু পরিচিত লোকের সঙ্গে আড্ডার সময় সুভাষ ভৌমিকের কাছ থেকে একশো টাকা জিতে নিয়েছিলেন দীপঙ্কর। ভাগ পেয়েছিলেন ষষ্ঠী। কারণ? নির্ভুল ইংরেজি বলে দেওয়া অনায়াসে। কে জানত যে তখনই গভীর অন্ধকারের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় হয়ে গেছে এঁদের। ঘটনার পর পর্যালোচনা হয়েছিল দুজনের। তাতে কিন্তু দীপঙ্করের পক্ষে যতটা সহানুভূতি ছিল তার চেয়ে কয়েকশো গুণ বাড়তি সহানুভূতি ছিল ষষ্ঠীর জন্য। দীপঙ্করের মধ্যে ফিচেল ব্যাপারটা ছিল, সকলেই জানত। কিন্তু ষষ্ঠী? ফুটবলারটির দুর্বিষহ ছোটবেলা, বেড়ে ওঠা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এইসব কিছুর জন্য ষষ্ঠীর পক্ষে হা-হুতাশ ছিল মুখে মুখে। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা প্রথমে একটু গুটিয়ে থাকলেও পরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে উতলা হয়েছিলেন। দেবজিৎ, দীপকরা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, ওদের ছেড়ে দিন। সুস্থ জীবনে ধরে রাখার দায়িত্ব নেব আমরা। এই মুখ খোলার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল সুভাষ ভৌমিক এবং বাইচুং ভুটিয়ার।



ষষ্ঠীদের জন্য উদ্বিগ্ন সুভাষ, বাইচুং

লড়ে যাব, বিপথে যাওয়া দুজন প্রতিভাবানকে আবার সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যেদিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আগের দিনই ঘটেছিল বিপর্যয়ের কাণ্ড। ষষ্ঠী দুলে এবং দীপঙ্কর রায় যখন গভীর ঘুমে তখনই পুলিস অভিযান চালিয়ে ষষ্ঠীর হরিপালের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে। ষষ্ঠী তখন দমদমের জপুরের মেসে ছিলেন। সকালে তিনি যখন অনুশীলনে আসার পথে তখনই জানতে পারেন বিপর্যয় ঘটে গেছে। সেদিন কোনক্রমে অনুশীলন সেরে তিনি আশ্রয় নেন ইস্টবেঙ্গল সাজঘরের আড়ালে। ক্রম বার্তা ছড়িয়ে যায়, ইস্টবেঙ্গল তাঁবু গন্তব্য হয়ে যায় সংবাদমাধ্যমের। উৎসাহী মানুষেরও। প্রথমে বিষয়টা ষষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকলেও দীপঙ্করের জড়িয়ে থাকাটা প্রকাশ হতে বিশেষ সময় লাগেনি। তৎপরতা শুরু হয় সুভাষ ভৌমিক এবং কর্তাদের তরফে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত হয়ে কার্যত কেঁপে যাওয়া ষষ্ঠী জানান, 'আমার বাড়িতে এসেছিল কিন্তু আমি তা কাউকে জানাতে পারিনি প্রাণভয়ে।' সেদিন এই কথাগুলো বলতে গিয়ে যেভাবে কেঁপেছিলেন ষষ্ঠী তেমন কিছুর আভাস কিন্তু তাঁর আচরণে পাওয়া যায়নি তার আগের কয়েকদিনের অনুশীলনে। দিব্যি অনুশীলন

দুজনেই প্রকাশ্যে, কখনও একাকী, কখনও যৌথভাবে দাবি তুললেন, ষষ্ঠী-দীপঙ্কররা কেউ জন্মগত আসামি নয়। অন্যায় করেছে ঠিকই কিন্তু একটু বিবেচনা করে যদি মুক্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে মাঠের ছেলেদের মাঠেই ধরে রাখার চেষ্টা করব ভবিষ্যতে। সুস্থ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মন্ত্র শেখাব। শুধু এইটুকু বলা নয়, সুভাষ-বাইচুং প্রকাশ্যে খাবার নিয়ে গেলেন, দেখা করতে গেলেন জেল হাজতে। দুজনের এমন আচরণে তৈরি হল প্রবল জনমত। তাতে প্রশাসন টলে গেল এমন বলা যাবে না। তবে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হল যাতে করে সকলের মনে হওয়া শুরু হল, একবার সুযোগ দেওয়াই যাক না!

সুযোগ পেলেন ষষ্ঠী দুলে এবং দীপঙ্কর রায়। অগণিত ক্রীড়াপ্রেমী, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম— সকলের যৌথ প্রয়াসে। সুস্থ জীবনে ফেরার সুযোগ। তবে সুযোগটা পাওয়ার আগে কিছুদিন পুলিস থানা, জেল হাজতে থাকতে বাধ্য হলেন দুই ফুটবলার। নিশ্চয় তাঁরা শিক্ষা পেলেন, আগুন নিয়ে খেললে হাত পোড়ে। শিক্ষা মাথায় রাখলে ভাল, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে লাভবান হবে আগামী প্রজন্মের ফুটবলাররা।

ষষ্ঠী, দীপঙ্কররা দয়া করে মাথায় রাখবেন!

প্রলোভনের শিকার





মাঠে ফিরিয়ে আনাটাই এখন প্রথম কাজ



রুমা মুখার্জি

শহর জুড়ে তখনও শারদ উৎসবের রেশ। থিম পুজোর দাপটে সরগরম এ-পাড়া সে-পাড়া। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ২৭ অক্টোবর ষষ্ঠী দুলে এবং দীপঙ্কর রায়ের গ্রেপ্তারের খবরে শহর উত্তাল। জাতীয় দলে খেলা এই দুই ফুটবলারের গ্রেপ্তারের খবরে তোলপাড় ফুটবল মহল। অবশ্য শুধু ফুটবল মহলই নয়, আলোড়ন তুলেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে। অভিনেতা থেকে গায়ক, শিক্ষক থেকে ডাক্তার— বিভিন্ন সরকারি কর্মী সবার মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া। বেশির ভাগ মানুষ ওঁদের পাশে দাঁড়ালেও সবাই কিন্তু এটা মানছেন অন্যায় ওঁরা করেছেন। প্রদীপ ব্যানার্জি বলছিলেন, 'ফুটবল সমাজের স্পর্শকাতর জিনিসের মধ্যে একটা। ভাবতে খুবই খারাপ লাগছে। তবুও একটা কথা মানতেই হবে এ সব ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পারিবারিক শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। ভাল পরিবার এবং পরিবেশ একান্ত জরুরি। পেলে, মারাদোনা, শচীন, কাম্বলিকে দেখ। এই চারজনের খেলার প্রতি ভালবাসা দক্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু মারাদোনা ও কাম্বলির মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। ষষ্ঠীও তাই। আমাদের, চুনীর সময় অনেকেই নানা প্রস্তাব দিত। আমরা কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরিনি। লক্ষ্য থেকে সরলে চলবে না। জানতে হয় কোথায় থামতে হবে।' পক্ষে এবং বিপক্ষে সরাসরি কোনও কথা না বলেও অনেক কিছু বলে গেলেন চুনী গোস্বামী। 'আমি ফুটবল সম্পর্কে কথা বলব। যেটা ঘটেছে তা কিন্তু ফুটবল সংক্রান্ত কোনও ঘটনা নয়। দেখ বিজয়নকে। ভাবলে গর্ব হয়। ফুটবলের জন্য ওর অবদান কম নয়। ৫০ হাজার টাকা ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে দিয়েছে। একজন ফুটবলার হিসেবে এটাই তো স্বাভবিক। সেই প্রকৃত অর্থে ফুটবলার যে ফুটবলের উন্নতির কথা ভাববে নিজের খেলার কথা ভাবে। অর্থের প্রয়োজন আছে। ঘাম ঝরিয়ে অর্থ রোজগার করতে হয়। সে অর্থ সৎপথে ব্যয় হলে লোকে সাধুবাদ জানতে বাধ্য। বিজয়ন কিন্তু যথেষ্ট বড় মাপের ফুটবলার। ওর কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু।' সব সময় বিতর্ক থেকে নিজেকে রেখেছেন দূরে। তবুও এ ঘটনায় মর্মাহত শৈলেন মান্নার বক্তব্য, 'ওরা এত ভাল ফুটবল খেলে। ওরা কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।' মেঘের আড়ালে যে সূর্যটা লুকিয়ে আছে তারই অপেক্ষায় সুরজিৎ সেনগুপ্ত। 'আগেও বলেছি ভাল করে তদন্ত হোক তা হলে অনেক মেঘ কেটে যাবে। ষষ্ঠী তো স্বীকার করছে। হাতকাটা দিলীপকে ওর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল যাই হোক ওদের যখন আদালতে তোলা হচ্ছে তখন তদন্তের সূচনা হল। কয়েক দিনের ঝড়ঝাপটায় ফুটবলটা প্রায় কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এবার নিশ্চয় কলঙ্ক মোচন হবে ফুটবলের।' ষষ্ঠীদের পাশে আছেন শান্ত মিত্র। 'দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সবাই মিলে লিখিত আবেদন করব। আসলে ওরা কেউই অপরাধী নয়। একটু ভুল করেছে মাত্র। এতদিন যে ঝাপটা গেল এটাই ওদের পক্ষে যথেষ্ট সাজা। আশা করি আগামী প্রজন্মের কাছেও এটা একটা বড় নজির হয়ে থাকবে। আমার মনে হয় বিষয়টা সহানুভূতির

সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। স্বল্পভাষী বিনয়ী হাসিখুশি প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল। কোনও রকম বিতর্কে জড়ায় না নিজেকে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে ভাল ছেলের ভাবমূর্তি। বিদেশি এবং ভিন রাজ্যের দাপট কলকাতার মাঠে তখন যে গুটিকয়েক বঙ্গসন্তান মাথা উঁচু করে ফুটবলটা খেলছেন তাঁদের অন্যতম ষষ্ঠী। সেই ষষ্ঠীর বাড়ি থেকে দাগি অপরাধী ধরা পড়াতে হতবাক অমল দত্ত। ৯৭-এ মোহনবাগানই ষষ্ঠীর প্রথম বড় ক্লাব। সেবার তাঁর দায়িত্বে ছিলেন ডায়মন্ড কোচ। পরে টালিগঞ্জে থাকার সময়েও কোচিংয়ে ষষ্ঠী প্রচুর ভাল ভাল ম্যাচ খেলেছে। সেই ষষ্ঠী যে এভাবে একটা ঘটনায় জড়িয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছিল অমল দত্তর। 'ষষ্ঠী তো? নাকি অন্য কেউ? টালিগঞ্জে ওকে দেখেছি বেশ কয়েক বছর। মাঠে এবং মাঠের বাইরে এরম বাধ্য ফুটবলার খুব কমই আছে। ওর বাড়িতেও একবার গেছি। দারিদ্র্যের চিহ্ন চর্তুদিকে। ওই বাড়ি থেকে ময়দানে এসে ফুটবল খেলছে ভাবই যায় না। সেই ষষ্ঠী এভাবে বদলে যাবে অবিশ্বাস্য।' সুব্রত ভট্টাচার্যের কোচিং-এ কখনও খেলেননি ষষ্ঠী। তা সত্ত্বেও এ ঘটনায় আহত সুব্রত। 'সমাজবিরোধী ওর বাড়িতে ছিল বলে ষষ্ঠীও এরকম হয়ে গেছে এটা মানা যয় না। খুবই ভাল ছেলে। গ্রামের ছেলে তো, একটা দারুণ সরলতা ওকে ঘিরে থাকে। পরিশ্রম করে উঠে এসেছে। বল প্লেয়াররা কখনও খারপ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। মনে হয় ও কোনও কারণে ফেঁসে গেছে। এ সব থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার। সমাজিক অবক্ষয় কোথায় পৌঁছেছে। আইনের পথে বাধা না হয়েও ষষ্ঠী-দীপঙ্করকে শোধরানোর কথা ভাবছিলেন কোচ সুভাষ ভৌমিক। 'ওরা আমর সন্তানতুল্য। এ বিপর্যয়ের সময় ওদের পাশে থাকাটা আমার কর্তব্য। খুবই দুঃখজনক হলেও আইনের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলে ওদের এটাই বোঝাব যে, ভুল মনুষমাত্রই করে। জীবনের নানা মোড়ে আছে নান প্রলোভন। সেগুলো উপেক্ষা করতে হয়। ওরা ফ্টবলার, ওদের মাঠে ফিরিয়ে আনাটাই আমার প্রথম কাজ। দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়।' ক্লাব যখন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা ভাবছে, দুই ফুটবলারের সম্পর্কে, ঠিক তখনই ওদের পাশে ওদের সহখেলোয়াড় এবং ভারত ফুটবলের অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। 'হয়ত এই কাজটা করতে ষষ্ঠী বাধ্য হয়েছে। ওর সারল্যের সুযোগ নিয়েছে কেউ কেউ। ওকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। সত্যি বলতে আমি ভয় করি না। আমি এখনও বিশ্বাস করি ষষ্ঠী নির্দোষ। ওকে সবরকম সাহায্য আমি করব। আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ওদের প্রতি। দেশের হয়েও খেলেছে সেই মর্যাদাটুকু যেন ওদের দেওয়া হয়।' বাইচুংয়ের পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থন করে রেনেডি সিং বলেন, 'ওর মতো একটা ভাল ছেলের সঙ্গে এরকম অন্যায় সহ্য করব না। সাধ্যমতো সাহায্য করব।' ষষ্ঠী-দীপঙ্করের জন্য পুরো ফুটবল জগতের ভাবমূর্তিনষ্ট হওয়ায় হতাশ প্রসূন ব্যানার্জি। 'আমাদের মতো প্রাক্তনদের কাছে এটা বড় লজ্জার। দোষ তো দুজনেরই আছে। তবে এখন যেন বিচারটা ঠিক হয়। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ রইল, অন্য কাউকে বাঁচাতে গিয়ে যে ওদের ঘাড়ে দোষ চাপানো না হয়। তাহলে আরও কলুষিত হবে ফুটবল সমাজ।' ব্যাপারটা দুঃখজনক বলছিলেন সম্বরণ ব্যানার্জি। তাঁর মতে, কি বা ভুল পরের কথা। কোনও মানুষের কাছে বিশেষ করে কোনও খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এ ধরনের হীন মানসিকতা কাম্য নয়।' খবর শুনে দারুণ হতাশ গৌতম সরকার। 'যখন দেশের ছেলেদের জন্য লড়াই করছি, তখন এ কী করল ওরা। কেন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে হল— এর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কী পরিস্থিতিতে এমন ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করল বুঝতে পারছি না। ফুটবলের সঙ্গে এর কোনও সূত্র নেই।' একদমই বিরল ঘটনা বলছিলেন আই এফ এ সচিব সুব্রত দত্ত। তিনি আরও বলেন, 'তবে আমি বলব, পুরো বিষয়টা যেন ভালভাবে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ ওরা তো অপরাধী নয়। ভুল করেছে মাত্র।' গ্যালারিতে বসে ওদের খেলা দেখেছি। বলছিলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি। 'ওদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। যারা ওদের ঘনিষ্ঠ, জানবে তারাই। তবে এখনকার ছেলেমেয়েরা বড় অল্পেই প্রলোভনে পা দেয়। কিন্তু আমি ভাবি নিজস্ব সত্তা ছাড়ব কেন? ভাল-মন্দ বোঝার মতো বয়স ওদের হয়েছে। যদি না বুঝে কিছু করে থাকে, তাহলে আলাদা। তবে আইন তো আইনের পথেই চলবে। তাই চাই।' ইদানীং প্রাণোচ্ছল ষষ্ঠী চুপচাপ বসে থাকতেন ড্রেসিংরুমে। কোচের গালাগালি, সতীর্থদের খুনসুটি কোনও কিছুই তাঁকে প্রভাবিত করত না। 'আমি যখন মোহনবাগানে ছিলাম, তখনও ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ওরা এভাবে জড়িয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি।' হতভম্ব দেবজিৎ ঘোষ যখন এ সব বলছিলেন, তখন ডগলাসের মাথায় অন্য চিন্তা। 'পুলিস ওদের মারছে নাকি? ছেলে দুটো শেষ হয়ে গেল মনে হচ্ছে।' পাওলোর কাছে জানতে চাইলেন, 'আমাদের দেশে কখনও এরকম খুনিদের সঙ্গে ফুটবলারদের যোগাযোগের কথা শুনেছ?' মর্মাহত অলোক মুখার্জি, 'ভাল ছেলে বলে জানতাম। আমার কাছে অনুশীলনও করেছে। শুনে খুব খারাপ লাগছে। তবে এখন দিনবদলের পালা এত দ্রুত যে, পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। কোথাও গণ্ডগোল নিশ্চয় আছে। কারণ ওরা তো খুব ছোট নয়।' পেশায় অভিনেতা। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে দারুণভাবে জড়িত ভাস্কর ব্যানার্জি। 'ভাবতে খারাপ লাগলেও পুরো ঘটনায় কিছু তো একটা আছে। ক্রিকেটে জাদেজা-আজহার। ফুটবলে ষষ্ঠী-দীপঙ্কর। ওদের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন হলেও অন্যায় তো করেছে।' সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'খেলা এখন আর দেখি না। তাই ঠিক বলতে পারব না, ওরা ঠিক কতটা ভাল ফুটবলার। তবে আরও জলঘোলা হবে বলে মনে হয়।' 'এরকম ঘটনা প্রথম নাকি? আগেও ঘটেছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ সব দেশেই হয়। এই দু'জন ফুটবলারকে নিয়ে ইস্যু তৈরি হল।' বলছিলেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা দিলীপ রায় বলছিলেন, 'যদি কোনও অপরাধ করে থাকে আইনমাফিক শাস্তি হোক। কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে লাভ নেই। কারণ এরা তো আর দাগি আসামি নয়।' গায়ক শিবাজি চ্যাটার্জির মতে, 'আমি নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব কেন যেখানে আমার ব্যক্তিসত্তা বিকিয়ে দিতে হবে? দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।' যাঁরা আজ একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা কীভাবে একাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেললেন? জিজ্ঞাসা সৈকত মিত্রের। আইনজীবী জয়মাল্য বাগচী বলছিলেন, 'সঠিক কি বেঠিক পরের কথা। আমার ধারণা পুলিসি অভিযোগটা ভিত্তিহীন নয়। তবে ফেরার আসামিকে ধরে পুলিসের সাধুবাদ প্রাপ্য। আর জেনেশুনে ফেরার আসামিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া অপরাধ। যদিও জামিনযোগ্য। তবে এখন কিন্তু অপরাধের পরিবেশ বদলে গেছে।' বিধায়ক তাপস রায় ছোট্ট কথায় বললেন, 'পয়সায় মাথা ঘুরে গেছে।' বিধাননগর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ দীপক মণ্ডল বলছিলেন, 'শিক্ষা মানে তো বি এ এম এ পাস নয়। শিক্ষা আলাদা ব্যাপার। যে ঘটনা ঘটেছে তার পিছনে অশিক্ষাই প্রধান কারণ। উপযুক্ত শিক্ষা থাকলে এ কাজ করার আগে অন্তত দশবার চিন্তা করত।' স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী বলছিলেন, 'এখন আর ভাল কিছু শুনি না। কাগজ খুললে শুধুই খারাপ খবর। অর্থ হাতে আসলে বিপথে যেতে হবে এমন কি কোনও নির্দেশ আছে? দোষী তো ওরা বটেই। খেললেই অপরাধী হবে না, এ যুক্তিটা মানতে পারছি না। ফুটবল একদিকে অপরাধ অন্যদিকে। দুটোকে এক করলে হবে না। একদিনে কি আর এই ঘটনা ঘটেছে?' 'কেউ মনে রাখে না। আজকের উত্তেজনা কালই থিতিয়ে যাবে।' বলছিলেন কলকাতা টেলিফোনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক অনিল ভট্টাচার্য। 'মাঠে বার কয়েক দেখেছি ওকে। ভাল খেলে কি না পরের কথা। কিন্তু দোষী তো বটেই। আইন চলবে আইনের মতোই। তবে এর পরের ঘটনা আর হয়ত আমরা সাধারণ মানুষ জানতে পারব না।' ষষ্ঠী খুব ভালবাসে ছবি তুলতে। প্রায়ই বলত আমার ছবি তুলুন। বাইচুংয়ের দৌলতে অনেক নামীদামি মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ষষ্ঠী। হয়ত অনেক ছবিও তুলেছিলেন। তবে আজকের ছবিটা বোধহয় দেখতে চায়নি ষষ্ঠী এবং দীপঙ্করও।





ট্রফি জেতার মতো দল গড়তে পেরেছে মোহনবাগান ?

ডুরান্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল



মৃণাল চট্টোপাধ্যায়

এটাই প্রত্যাশিত ছিল। মোহনবাগান সদস্য-সমর্থকরা হইহই করে উঠবেন আমার এই লেখা পড়ে। কিন্তু তাঁদেরও ভাবতে বলছি সত্যি কি মোহনবাগান ট্রফি জেতার মতো ভারসাম্যমূলক দল এবারও গড়তে পেরেছে। মোহনবাগানের বরাবরের সমস্যা, আক্রমণ ও মাঝমাঠ যত ভাল, রক্ষণভাগ তত খারাপ। মাঝে ব্যারেটোর মতো একজন বিদেশি ফুটবলার পেয়ে আক্রমণের ধার এতটাই বেড়েছিল যে রক্ষণের দুর্বলতা অনেকটাই ঢেকে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরোটা যায়নি। এই কারণে সেক্ষেত্রে সুভাষ ভৌমিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছে মোহনবাগান, সেক্ষেত্রে ব্যারেটোও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। ব্যারেটোকে তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে দেননি সুভাষ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। সুতরাং ব্যারেটোও যেখানে পারেননি, অন্য ফুটবলাররা যে ব্যর্থ হবেন এটাই স্বাভাবিক। গত দু মরসুম অন্তর্কলহে জড়িয়ে মোহনবাগান নিজেদের লড়াইয়ের মানসিকতা নষ্ট করে ফেলেছিল। খেলার মাঠে মোহনবাগানের দল প্রতিপক্ষ যত না ইস্টবেঙ্গল, তার থেকে অনেক বেশি নিজেরাই কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি করে মরছেন। আর তাতে উলুখাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে। ট্রফিও হাতছাড়া হচ্ছে। চলতি মরসুমের কথা ভেবে যখন দল গড়া শুরু করেছিলেন মোহনবাগান কর্তারা, তখন কোচ ছিলেন অলোক মুখার্জি। তাঁকে সামনে রেখে দলটা শে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একটা ঘোঁট তৈরি হল ক্লাবে। বলতে দ্বিধা নেই অনেকে কোচ হিসেবে এখনও অনেক অপরিণত তবে দলে ভাল ফুটবলার থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই উতরে যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে ভারতীয় ফুটবলে কয়েকটি বিশেষ ম্যাচ ছাড়া কোচের ভূমিকা খুব বড় হয়ে দেখা দেয় না। এমনকি সুভাষ ভৌমিকের কোচিং বুদ্ধি, কৌশলের প্রশংসা করেও বলছি, এমন অনেক ম্যাচ দেখেছি, যেখানে সুভাষের দলের কাছে নাস্তানাবুদ


আজকাল প্রকাশন
খেলা
ড্যানিয়েল ভেট্টরি
এই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা
বাঁ-হাতি স্পিনার


The National Bank
The National Bank
The National Bank
SAINTHIA TOWN LIBRARY ★ BIRBHUM ★
SAINTHIA
SUPER কাম
AMAZING দাম
WARRANTY 36 months
100% MaintenanceFree CarBattery
Panasonic
MAINTENANCE FREE
Rs. 2090/-
Inclusive of all Taxes.
Against old Battery
DEALERS INQUIRY SOLICITED
Available at your nearest Base Terminal India's leading chain of battery showrooms
Branch Off: KOLKATA: # 660, Lake Gardens, Tollygunge, Kolkata -700 045.
Ph: 033 - 24171920 / 24223777. Fax: 033 - 24171922,
E-mail: cal@basecorporation.com
...be driven by technology
dial-a-battery
94330 365 24
days hrs
Panasonic Base Terminal
Base Terminal
Panasonic
Total Battery Solutions

ছবি: সোমনাথ পাকড়াশি



হলেও ট্রফি নিয়ে গেছে প্রতিপক্ষ। বুদ্ধিতে এর কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। তাই এটাকেই চান্স ফ্যাক্টর বলেন সুভাষ ভৌমিক। কিন্তু এই চান্স ফ্যাক্টরের কথা তখনই আসবে যখন সব কিছু ঠিকঠাক করা সত্ত্বেও সাফল্য আসে না। মোহনবাগান এ কথা বলতে পারবে না। শুরুতেই বলেছি, মোহনবাগান কর্তাদের দলগঠনেই বিরাট ভুল। এমন একটা দল তাঁরা গড়েছেন যার মাঝমাঠে অসংখ্য ফুটবলার অথচ আক্রমণ ও রক্ষণভাগটা নিতান্তই দুর্বল। এবং এর জন্য কোনওভাবেই দায় এড়াতে পারবেন না সুব্রত ভট্টাচার্য। গত মরসুমের শেষদিকে জাতীয় লিগের মোহনবাগানের অবনমন রুখে সুব্রত স্বমেজাজে ফিরলেন, তাতে দলের ক্ষতি হয়ে গেল। মোহনবাগান কর্তারা এক ঝাঁক টি এফ এ ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। এর মধ্যে হাবিবুর, দেবব্রত ছিলেন। দুজনেই ভারতীয় দলের রক্ষণে নিয়মিত খেলছেন। সুব্রত ভট্টাচার্য দুম করে বলে বসলেন, তিনি ট্রায়ালে না দেখে এঁদের সই করাবেন না। এখানেই সুব্রতর মস্ত ভুল। সব কোচই তাঁর নিজের মনোমতো দল বাছেন। কিন্তু তার জন্য নিজেকে একটা তালিকা দিতে হয় কর্তাদের কাছে আগাম। এবং তার জন্য বিভিন্ন ম্যাচ ঘুরে ঘুরে দেখতেও হয়। সুভাষ ভৌমিক যখন দ্বিতীয়বার ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে ফিরেছিলেন, তখন কর্তাদের কাছে প্রধান শর্ত ছিল, তাঁর পছন্দের দল দিতে হবে। সুভাষ তখন থেকে প্রতি বছর একটা ভারসাম্যমূলক দল হাতে পাচ্ছেন। এক পজিশনে একাধিক ফুটবলার। যার ফলে চোট-আঘাত অসুস্থতা বা জাতীয় শিবিরে ফুটবলার চলে গেলেও সুভাষকে বিরাট কোনও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু মোহনবাগানকে হচ্ছে। সুব্রত যদি আগাম একটা দল তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা বলতেন, তাহলে সমস্যা হত না। কিন্তু তিনি যখন তা করেননি, নিজেও অনেক ফুটবলারের খেলা দেখেননি, তখন একে নেব না, একে চাই এসব বলার মানে ছিল না। বরং এসব বলার জন্যই সুব্রত যেমন হারালেন হাবিবুর, দেবব্রতর মতো রক্ষণের ফুটবলারকে, তেমনই আরও অনেককে, যাঁরা সুব্রতর এই ট্রায়াল দেওয়ার অদ্ভুত কথা শুনে শেষ মুহূর্তে মোহনবাগানে আসার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান। তারই ফল ভুগতে হচ্ছে মোহনবাগানকে। এই মরসুমে চারবার মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। নানা কারণে দু-দলই পূর্ণশক্তিতে খেলতে পারেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার মানতেই হবে প্রতিটি বড় ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গলের সামান্য হলেও প্রাধান্য ছিল, তার একটাই কারণ মোহনবাগানের নড়বড়ে রক্ষণ। একই সঙ্গে স্ট্রাইকারে এমন কোনও ফুটবলার নেই অসীম ছাড়া যিনি ম্যাচ বের করে দিতে পারেন। তাও অসীম চোট-আঘাতে জর্জরিত। তাই মরসুমের শুরু থেকেই স্ট্রাইকার ও স্টপার পজিশনে বিদেশি ফুটবলারের খোঁজ চলছে। মোহনবাগান কর্তারা একের পর এক বিদেশি স্ট্রাইকার এনে চলেছেন, কিন্তু এখনও তেমন বড়রকম সাফল্য আসেনি তাতে। বরং রক্ষণের বেহাল অবস্থা মোহনবাগানকে রীতিমতো গাড্ডায় ফেলেছে। ইস্টবেঙ্গল ট্রফি জেতার জন্য পাগল। তারা ইতিমধ্যে ৭০-৮০ লাখ টাকা দেনা করে ফেলেছে বাজারে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই টাকা ঢেলেছেন দলের স্বার্থে। মোহনবাগানে সে গুড়ে বালি। শুধুই খেয়োখেয়ি। বলরাম চৌধুরি নিজে কিছু টাকা ঢেলেছেন ক্লাবের জন্য কিন্তু তাতে চাহিদা মেটেনি। সুব্রত বারবার বলে চলেছেন তাঁর দলে একজন ভাল বিদেশি স্ট্রাইকার ও স্টপার না হলে চলবে না, কিন্তু তিনি চাইলেই তা আসবে কোথা থেকে। অত টাকা দেবে কে? ম্যাকডাওয়েল থেকে টাকা বেরোনোর চাবিকাঠি তো অঞ্জন মিত্রদের হাতে এখনও। সব মিলিয়ে একটা ডামাডোল পরিস্থিতি। এর মধ্যে মোহনবাগান যে ভাল খেলছে এই যথেষ্ট, ট্রফি জিতলে হবে বাড়তি প্রাপ্তি। শিল্ডেই গলদটা ধরা পড়েছিল। কিন্তু কোচ সুব্রতর তো কিছু করার নেই।

কারণ তিনি তো আর মাঠে নেমে খেলতে পারবেন না। শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলকে সেমিফাইনালে হারিয়ে মোহনবাগান কর্তারা উচ্ছ্বসিত হতে পারেন, কিন্তু রঙিন চশমা চোখে থাকায় তাঁরা বোঝার চেষ্টা করেননি ম্যাচটা তাঁরা হারতে পারতেন ইস্টবেঙ্গল সেদিন দশ জন হয়ে না গেলে। কারণ তাঁরা এমন একটা দল গড়েছেন, যার রক্ষণ সারা ভারতের মধ্যে নড়বড়ে। একা ব্রাজিলিয়ান ডু সারা মরসুম কুম্ভর মতো দাঁড়িয়ে রক্ষণ সামলে দেবেন এটা যদি তাঁরা ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁরা খুব ভুল ভেবেছেন। ডু-র সঙ্গীরাও সাধারণত তেমন যুতসই নন। তার প্রমাণ শিল্ড ফাইনালেই মিলেছে। মায়ানমার দলের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে, শেষ মুহূর্তের গোল খেয়ে ম্যাচ টাইব্রেকারে এবং জয় হাতছাড়া। ডুরান্ডেও তার পুনরাবৃত্তি। এবং ইস্টবেঙ্গল নিজেদের স্বাভাবিক দলের ধারেকাছে না থাকা সত্ত্বেও। বলরাম চৌধুরি তো নিজে দিল্লিতে খেলা দেখে গেলেন। তিনি যদি চোখে ঠুলি পরে না থাকেন, তাহলে অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে একজন বিদেশি স্টপারের খোঁজ করুন। পারলে দুজন। ডু ভাল কিন্তু কখনওই আহামরি মানের নন। মন্দের ভাল। আক্রমণভাগে সেক্ষেত্রে একজন ভাল বিদেশি স্ট্রাইকার হলেই চলবে। নইলে এবারও শূন্য হাতে মরসুমটা শেষ করতে হবে মোহনবাগানকে। ডুরান্ড সেমিফাইনালের আগেই বোঝা গিয়েছিল মোহনবাগানের ট্রফি জেতা বেশ কঠিন। কারণ যে মুহূর্তে ডু দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখলেন, সে মুহূর্তে কোচ সুব্রতর রাতে ঘুম ছুটে গেল। শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দুলালকে কলকাতায় ছেড়ে এসেও শেষ পর্যন্ত দলের স্বার্থে তাঁকে আপস করতে হল। তাতেও অবশ্য শেষ রক্ষা হল না। কারণ প্রথমত দুলাল প্রকৃত স্টপার নন। কর্মকর্তারা এমন কিছু ফুটবলারকে এবার স্টপারে সই করিয়েছেন, যারা সারা মরসুমটা চোট-আঘাতেই কাটালেন। এঁরা হলেন হোসেন মুস্তাফি, পলাশ কর্মকার, তপন ঘোষ। মেহরাজ ছাড়া স্টপারে ডু-র পাশে খেলার কেউ ছিল না ডুরান্ডে। ডু মাঠের বাইরে গেলে তার পরিবর্ত দুলাল। আর মেহরাজ পেশিতে টান লেগে ফাইনালে খেলতে না পারায় পরিস্থিতি আরও জটিল হল। ডু ও দুলাল জুটি স্টপারে যখন কিছুটা ভরসা দিচ্ছে, তখনই ডু চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেলেন। তাতেই গোটা দলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। একটা বড় ম্যাচ বারবার ছক বা কৌশল পাল্টানো যায় না। বরং নতুন ফুটবলার এনে আক্রমণের ধার বাড়ানো যায়, কিংবা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, দুর্বলতা ঢাকা নয়। মোহনবাগানকে ডুরান্ড ফাইনালে শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতেই লড়তে হয়েছে। নইলে এমন অগোছালো ইস্টবেঙ্গলকে আর মোহনবাগান পরবর্তী সময় পাবে বলে মনে হয় না। ফেডারেশন কাপ থেকেই ইস্টবেঙ্গল পুরো শক্তির দল পেয়ে যাবে। এমনিতেই ইস্টবেঙ্গল কোচ সুভাষ ভৌমিক ভীষণ খুঁতখুঁতে। সারা বছর দল নিয়ে ভাবেন। কেন গোল হচ্ছে না, কেন দল গোল খাচ্ছে এ নিয়ে সর্বক্ষণ বিশ্লেষণ করে চলেছেন। কর্মকর্তাদের কাছে ভাল বিদেশির দরবার করে চলেছেন। বিদেশি ফুটবলারের জন্য হাঁকপাঁক করে আজেবাজে খেলোয়াড় নেওয়ার বিরোধী তিনি। তাতে সময় লাগুক। জুনিয়র, মাইক ওকোরোকে পাওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন। জুনিয়র হাতছাড়া হওয়ার আগে পাওলোকে এনে রেখেছিলেন। ছাড়েননি আনিয়েতো, ডগলাসকে। যখন বুঝলেন, জুনিয়রকে আর পাওয়া সম্ভব নয়, তখন জেরেমায়ার দিকে হাত বাড়ালেন। ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের মূল অস্ত্র ছিলেন জেরেমায়াই। এরপর ওকোরোকে যদি পেয়ে যান তাহলে তাঁকে রুখবে কে? তখন ডগলাসকেও ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবেন না সুভাষ। আর দীপক, বাইচুং, সুভাষ চক্রবর্তী, সুরেশরা সুস্থ হয়ে দলে ফিরবেন। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সত্যি ঝামেলার হবে অন্য দলগুলোর। ডুরান্ডের এই জয়টা তারই একটা নমুনা। ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের ঘিরে যে বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যেও মাথা ঠিক রেখে ইস্টবেঙ্গল যখন ট্রফি জিততে পেরেছে, তখন পরবর্তী সময়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল না মারলে তাদের থামানো খুব কঠিন। সবচেয়ে বড় কথা এবার ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য এল মূলত ভারতীয় এবং খোদ কলকাতার ছেলের দাপটে। চন্দন দাসের দুটি গোলে। একটি তো বিশ্বমানের। বিদেশি দুই ফুটবলার ছিলেন। ডগলাস ও জেরেমায়া। ডগলাস তো নিজ গোলে বল পাঠিয়ে রীতিমতো ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলেন দলকে। জেরেমায়া নতুন হলেও দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছেন। গোল না পেলেও তাঁর ভূমিকা আছে জয়ের পেছনে। তবে তাঁকেও মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, নইলে মাধব দাসের মতো লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে থাকতে হবে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই। তাই ভারতীয় ফুটবলারদেরই বেশি কৃতিত্ব দেব এই জয়ে। কারণ ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের ঘটনার প্রভাব এড়িয়েও তাঁরা দীপাবলির সেরা উপহারটা দিয়েছে লাল-হলুদ সদস্য-সমর্থকদের।



একমত বাড়ি থেকে পাড়া

চক্রান্তের শিকার দীপঙ্কর

অমৃতাংশু ভট্টাচার্য





ইস্টবেঙ্গলের লিস্টার সফরের সময়ের ঘটনা। দল ফিরে আসার পরও এই প্রতিবেদনকে আরও কয়েকদিন লণ্ডনে থেকে যেতে হয়েছিল। ফিরে যাওয়ার দিন হিথরো বিমানবন্দরে গোটা দল দাঁড়িয়ে। হঠাৎ এগিয়ে এল দীপঙ্কর রায়। 'শোনো, গিগ্‌সকে ফোন করে দিয়েছি। কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করে নিও।' বলে গম্ভীর মুখে সরে গেল ওখান থেকে। কলকাতায় ফেরার পর দেখা হতেই ওর প্রথম কথা, 'কী হল, তুমি যাওনি? গিগ্‌স ফোন করে বলল, তোমার বন্ধু তো এল না।' এই হচ্ছে দীপঙ্কর। গম্ভীর মুখে সারাক্ষণ মজা করছে, এর পেছনে, ওর পেছনে লাগছে। আর এই ছটফটে, মজারু দীপঙ্করকেই চেনেন সহ-খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ওর পাড়া বাঁশদ্রোণীর বিদ্যাসাগর পার্কের লোকজন। দশ বছর বয়সে তিনি এসেছিলেন এখানে। পাড়ার বাঁশদ্রোণী ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যদের প্রিয় দীপু। সেই দীপুই যে এভাবে সমাজবিরোধী বলে পুলিস তুলে ধরবে, এটা কিছুতেই মেনে নিচে পারছেন না দীপঙ্করের পাড়া-প্রতিবেশী, ক্লাবের বন্ধুরা। তাই এই দুঃসময়ে তাঁরা সবাই দাঁড়িয়েছেন দীপঙ্করের পরিবারের পাশে। ক্লাবের প্রাক্তন সচিব অজয় মাহাতো, দীপঙ্করের বাল্যবন্ধু বিশ্বজিৎ মুহুরু— সবার কথা থেকেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার, দীপঙ্কর দুষ্টু হতে পারে, ছেলেমানুষ হতে পার, কিন্তু বদমায়েশ, সমাজবিরোধী কিছুতেই নয়। দীপঙ্করের গায়ে সেঁটে দেওয়া এই নতুন তকমাটা তাঁদের গায়েও তাই অপমান হয়ে বিঁধছে। সেই দশ বছরের ছেলেটার তারকা হয়ে ওঠার পথের কোনও মোড়ে হাতকাটা দিলীপ বা তার মতো সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার মতো কোনও ঘটনা তাঁদের চোখে পড়েনি, তাঁরা বিশ্বাসও করেন না। যে ধাক্কা দীপঙ্করের পাড়া প্রতিবেশীদের এতটা নাড়া দিয়ে গেছে, তাঁর পরিবারের কাছে তো তা হঠাৎ আছড়ে পড়া সাইক্লোনের মতো। উদ্বিগ্ন মুখে চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছেন দীপঙ্করের বাবা রতন রায়। কখনও আইনজীবীদের সঙ্গে, কখনও বা ক্লাবকর্তাদের কাছে ছুটে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। কোচ সুভাষ ভৌমিকের ভরসায় দীপঙ্কর, ষষ্ঠীর জন্য জামা-কাপড়, খাবার নিয়ে গেছেন বিধাননগর উত্তর থানায়। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মুখ খুলতে না চাওয়ার আকুতি। আসলে হঠাৎ করেই তাঁদের সব কথা হারিয়ে গেছে। আকস্মিক ধাক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দীপঙ্করের মা। বোন প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ১৭ নভেম্বর। কিন্তু সবাই সব ভুলে চাইছেন স্বাভাবিকতার বাতাবরণ ফিরুক বাড়িতে। স্বাভাবিক ফুটবলের ছন্দে আবার মেতে উঠুক দীপঙ্কর। আর এই প্রত্যাশার আড়ালে জমাট বাঁধছে একটা ক্ষোভ। যারা চক্রান্ত করে ফাঁসালো দীপঙ্করকে, তাদের কেন শাস্তি হবে না।?

হঠাৎ আসা সাফল্য, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল দীপঙ্করের। ধরা পড়ার পর এই অভিযোগটাই বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। আর তাই নাকি তিনি ঘনঘন বদলেছেন বন্ধু-বান্ধব, গাড়ি, আসবাব। দীপঙ্করের ক্লাবের বন্ধুরা কিন্তু ওর পাশে দাঁড়িয়ে এই সব অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য তারকা হয়েও দীপঙ্কর বদলায়নি। হ্যাঁ, তাঁর রোজগার বেড়েছে। কলকাতা ফুটবলের তারকা ফুটবলাররা এখন যা টাকা পান, তাতে তাঁরা গাড়ি বদলাতেই পারেন বা বাড়ি সাজাতেই পারেন। সেজন্য হাতকাটা দিলীপদের সাহায্য দরকার হয় না। তবু কেউ কেউ মেনে নিচ্ছেন হয়ত ব্যবসা করতে গিয়ে কোনওভাবে কোনও সময় অন্ধকার জগতের কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল দীপঙ্করের। কিন্তু সেজন্যই তিনিও অপরাধী হয়ে গেছেন, মানতে রাজি নন কেউ। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত। নিজের প্রতিভার প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করেননি দীপঙ্কর। তা না হলে তিনি এমন উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারতেন। যেখানে হাতকাটা দিলীপের মতো নামগুলোও অনেক পেছনে পড়ে থাকত।

নীলরতন কুণ্ডু

ষষ্ঠী অপরাধ করতে পারে না



হরিপালের পশ্চিম গোপীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ন-পাড়া গ্রাম। এই গ্রামের আশপাশেই রয়েছে ভাড়ামল্লভপুর, বাঁশরি, গোপীনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম। চারদিকে শুধু ধানক্ষেত, আর তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে আলপথ। গ্রামগুলি কৃষিনির্ভর এলাকা। তবু আজ গোটা পশ্চিম গোপীনাথপুর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে ন-পাড়া গ্রামের ছেলে বিখ্যাত ফুটবলার ষষ্ঠী দুলের জন্য। ওর গ্রামে আবার দুটি রাস্তা, একটি হল ভাড়ামল্লভপুর দিয়ে যেতে হবে, নয়ত বাঁশরি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তবে ভাড়ামল্লভপুর দিয়ে আলপথ ধরে কয়েক কিলোমিটার এগোলেই চোখে পড়বে সরাই মনসাতলা ক্লাবের মাঠ। ওই মাঠের চারদিকে জুড়ে শুধু ধানক্ষেত। ছোটবেলা থেকে ওই সরাইমনসাতলার মাঠে ফুটবল খেলেই আজ বিখ্যাত হয়েছেন ষষ্ঠী দুলে। সেই ষষ্ঠী দুলে যে তাঁর বাড়িতে হাতকাটা দিলীপের মধ্যে একজন কুখ্যাত অপরাধীকে কয়েক মাস যাবৎ আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন, এ কথা ভাবতেও পারেন না গ্রামবাসীরা। ষষ্ঠী দুলের বাড়ি থেকে পুলিস যেদিন হাতকাটা দিলীপকে ধরে নিয়ে যায়। তার পরদিন খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েননি গ্রামবাসীরা। বহু গ্রামবাসীই ষষ্ঠীর পরিবারের প্রতি বিষোদ্গার করে বলেন, 'আমাদের ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে যে ষষ্ঠী এই গ্রামের ছেলে। ওর জন্য গোটা গ্রামের মানুষের এখন লজ্জা। যে আমাদের গর্ব ছিল — তাকে নিয়ে ভাবতেও এখন আমাদের

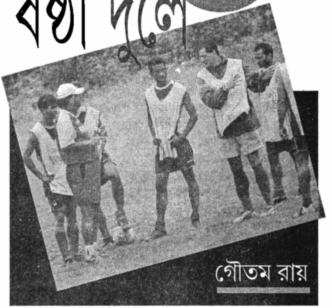
লজ্জা হচ্ছে।' ষষ্ঠীর আদর্শকে লক্ষ্য করে ন-পাড়াসহ আশপাশের গ্রামের অনেক ছেলেই চেয়েছিলেন ফুটবলার হতে। বাড়ির অভিভাবকরাও চেয়েছিলেন তাঁদের ছেলেরা ষষ্ঠীর মতো একজন প্রখ্যাত ফুটবলার হয়ে উঠুক। কিন্তু ষষ্ঠীর বাড়ি থেকে হাতকাটা দিলীপ গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় এবং পরে ষষ্ঠীকেও পুলিস গ্রেপ্তার করায় — গ্রামের মানুষরা তাদের ছেলেদের ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন থেকে বিরত হয়েছিলেন। ঘটনার পর থেকে ছেলেদের মাঠে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিমত ছিল এই রকমই, ঘরের ছেলে ঘরে থাকুক। প্রয়োজন নেই ষষ্ঠীর মতো বিখ্যাত হয়ে। কিন্তু ষষ্ঠীর জামিন হওয়ার পর সেই গ্রামবাসীদেরই মতামত গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। যাঁরা গ্রামের বদনামের জন্য বারে বারেই ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন ষষ্ঠী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে, তাঁরাই এখন বলছেন ষষ্ঠীর মতো ছেলে অপরাধ করতে পারে না। ওঁকে ফাঁসানো হয়েছে। এখন মিলন সেন, বিশ্বনাথ বাউরি, মনসা, রাজেশ, বুড়ো, বাবলু, যিশু ও স্বপনরা চান— যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আমরা চাই ষষ্ঠী আবার মাঠে ফিরে আসুক। নতুন করে মন দিক খেলায়। ষষ্ঠীর মনসাতলা মাঠের খেলোয়াড় বন্ধু ও সতীর্থরা জানান ষষ্ঠীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে গ্রামগুলো যেন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। খেলতে আসছিল না কেউ ভয়ে। এখন আবার সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। ষষ্ঠী ছাড়া পাওয়ায় সবাই যেন নতুন করে খেলাধুলোয় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। প্রায় ৪০-৪৫ জন যুবক নিয়মিত ফুটবল খেলেন ন'পাড়ার সরাইমনসাতলা মাঠে। তাঁদের অধিকাংশই এক বাক্যে জানান — বড় অভাবের মধ্যে দিয়ে দিন কেটেছে ষষ্ঠীদের। সামান্য একটা কুঁড়েঘরে বাস করত ওরা। ছোটবেলায় চাষবাসও করেছে ষষ্ঠী। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মাঠে ধান কাটতেও গেছে। ওই অভাব আর দারিদ্র্যতাকে অবলম্বন করেও ষষ্ঠীর মধ্যে ছিল প্রবল ফুটবল খেলার নেশা। সারাদিন কাজের শেষে বিকেলে খেলাধুলো করত ষষ্ঠী। ওর বাড়ির লোকজন বলত ওসব খেলে কি হবে? তার চেয়ে মাঠে চাষবাস করলে রোজ ৫০ টাকা রোজগার হবে। কিন্তু ষষ্ঠী সে সব কথায় গুরুত্ব দেয়নি। শেষে ওর ফুটবলের নেশা দেখে দাদা উদয় ষষ্ঠীকে শেখাতে শুরু করল ফুটবল। রোজ ভোরে ষষ্ঠীকে মাঠে নিয়ে যেতেন দাদা উদয়। ৪-৫ ঘণ্টা করে দৌড়োনো প্র্যাকটিস করানো, দম বাড়ানোর পথ দেখানো, কীভাবে ফুটবল খেলবে ইত্যাদি সবই ছোটবেলা থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন উদয়। তারপরেই খেলতে খেলতে আজ বড় হল ষষ্ঠী। ওর পায়ের জাদু দেখার জন্য ভিড় জমে যেত মাঠে। ষষ্ঠীর বন্ধুরা আরও জানান ষষ্ঠী যখন প্রথম ডাক পেল মোহনবাগানে, তখন কলকাতার মাঠে প্র্যাকটিসের জন্য রাত দুটোয় উঠে পড়ত ঘুম থেকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— একটি সাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্বে হরিপাল স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় ছুটত ষষ্ঠী। এইরকম কষ্ট করে তবেই বড় হয়েছে। সেই ষষ্ঠীর খেলোয়াড় জীবনকে কেউ নষ্ট হতে দিতে চান না। নিতান্তই দরিদ্র, দিনমজুর পরিবারের ছেলে ষষ্ঠীর কঠোর পরিশ্রমের ফল একজন সফল ফুটবলার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাক— এটাই এখন গ্রামবাসীরা চান। ষষ্ঠীর বন্ধুরা জানান কলকাতায় জাতীয় লিগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে খেলেছে ষষ্ঠী। আশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গোটা গ্রামের মানুষ আনন্দ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। সে দৃশ্য ভোলার নয়। ষষ্ঠীকে



গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে, পাড়ার ক্লাব-সংগঠনের পক্ষ থেকে গণসংবর্ধনাও দেওয়া হল। ষষ্ঠী এখনও পর্যন্ত সময় পেলে গ্রামের বাড়িতে এলে মাঝেমধ্যেই মনসাতলার মাঠে এসে নতুন প্রজন্মের ছেলেদের খেলা দেখিয়ে দেয়, সেদিক থেকে ওঁর মধ্যে কোনও অহঙ্কার নেই। এটাই গ্রামের ছেলেদের কাছে বড় পাওনা বলে দাবি করেন সকলে। গোপীনাথপুর হাইস্কুলে ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছেন ষষ্ঠী। ওই স্কুলটি বাড়ির কাছেই। সেখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ত। পরে দারহাটা স্কুলে পড়াশোনা করেন। এলাকার বাঁশরি ক্লাবের ছেলেদেরও বহুবার খেলা শিখিয়েছেন ষষ্ঠী। তারা এখনও ষষ্ঠীকে ডাকেন। ষষ্ঠী সময় পেলে সেখানেও যান ছেলেদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতে। ষষ্ঠীর মা গীতা, দাদা উদয়, ভাই সঞ্জয়রা এখনও পর্যন্ত মনে করেন ষষ্ঠী কোনও অপরাধ করেনি। ওর ভাগ্য দোষে ওকে জেল খাটতে হল। সব কিছু গ্লানি ভুলে ষষ্ঠীকে আবার আগের মতোই মাঠে দেখতে চান সকলেই। ষষ্ঠী আরও বড় ফুটবলার হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক। এটাই কাম্য এখন বাড়ির আত্মীয়পরিজনদের।

ট্র্যাজেডির নাম ষষ্ঠী দুলে





গৌতম রায়

একেই কি বলে ট্র্যাজেডি? সত্যিই ট্র্যাজিক নায়ক ষষ্ঠী দুলে। কোথা থেকে কীভাবে উঠে এলেন, প্রচার আর গ্ল্যামারের আলোয় ঝলসালেন, তারপর এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়— সত্যিই গোটা ব্যাপারটা যে কোনও মানুষের হৃদয় মুচড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই মুহূর্তে ভীষণভাবেই বিতর্কিত ষষ্ঠী। অবাঞ্ছিত, বিতর্কিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখ অনেকেরই। কিন্তু কতটা জড়িত, কেন, কীভাবে জড়ালেন, সেটা এখানে আলোচ্য নয়। আমরা ফিরে দেখব হরিপালের সরাই ন'পাড়া গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারের ছেলেটি কীভাবে ষষ্ঠী দুলে হয়ে উঠলেন। বাবা কালীপদ দুলে ছিলেন ডি ডি সিফ্টর সামান্য মাইনের চাকুরে। তাঁর পাঁচ ছেলের চতুর্থ ষষ্ঠী। অভাব, দারিদ্র্য আর অনটন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন কালীপদবাবু। ষষ্ঠীর তখন বয়স? মাত্র চার। সেটা ১৯৮২। পাঁচ ছেলেকে নিয়ে মা গীতাদেবী পড়লেন অথৈ জলে। খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে থাকার অসম লড়াই। একমুঠো ভাত, একমুঠো মুড়ির জন্য কী না করেছে ষষ্ঠীর পরিবার। গোপীনাথপুর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পর পড়াশোনার পাট লাটে ওঠে ষষ্ঠীর। তখন যে বেঁচে থাকাই প্রায় অসম্ভব। পড়াশোনা চালাবেন কীভাবে? সারাদিন চলত ভাত জোগাড়ের কঠিন সংগ্রাম। ছোট্ট ষষ্ঠী কাজ করেছেন লোকের বাড়িতে, চায়ের দোকানে ধুয়েছেন কাপ, ৩০ টাকা রোজে জনমজুরি খেটেছেন। জমিতে আলুর বীজ বুনেছেন সামান্য পারিশ্রমিকে, পচা জলে পাট কেচেছেন দুটো পয়সার জন্য। অসহনীয় এক জীবন সংগ্রাম।

আর এরই মাঝে বড়দা উদয়ের উৎসাহে, অনুপ্রেরণায় খেলাধুলোর চর্চাটা চালিয়ে গেছেন। কীভাবে? শুরু লম্ফর আলোয় বাতাবি লেবু আর কাগজের গোলা বানিয়ে ফুটবল খেলা। বল কেনার টাকা কোথায়? তবে গ্রামে বিয়েবাড়ি থাকলে দারুণ মজা ষষ্ঠীর। জেনারেটরের আলোয় ফুটবল খেলাও যাবে, সঙ্গে বিনে পয়সার ভোজ।

সেই অর্থে ফুটবলের শুরু ১৯৮৯ সালে শিবপ্রসাদ ধাড়ার কাছে। সেই সময়ই বৌদির গয়না বিক্রি করে বড়দা কিনে দিলেন ফুটবল, বুট, জার্সি। সেটা ষষ্ঠীর জীবনের স্মরণীয় দিন। শুরু হল এক ট্র্যাজিক নায়কের উত্থানের পর্ব। আন্ডার হাইট প্রতিযোগিতায় খেলে তখন এলাকায় বেশ নাম হতে শুরু করেছে ষষ্ঠীর। বাঁচার লড়াইটা যে রক্তে, সহজাত। ফুটবল মাঠেও মাথা তুলে দাঁড়ানোর লড়াইটা শুরু হল ষষ্ঠীর। বুঝে গেলেন বেঁচে থাকার, বঞ্চনার-যন্ত্রণার অধ্যায়টা পেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র সোপান তাঁর ফুটবল। ফুটবলে লাথি মারার মধ্যেই জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্টটাকে লাথি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

১৯৯৪। হুগলির প্রত্যন্ত গ্রাম ন'পাড়া ছাড়িয়ে ষষ্ঠী পাড়ি দিলেন কলকাতার পথে। চাঁদু চ্যাটার্জি নিয়ে এলেন মৌরি স্পোর্টিংয়ে। তারপর দু'বছর তাঁর কোচিংয়েই ষষ্ঠী খেললেন জর্জ টেলিগ্রাফে। ডালপালা মেলতে শুরু করলেন ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে। গোটা পরিবার তখন চাতক পাখির মতোই ষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮— দু'বছর ষষ্ঠী খেললেন মোহনবাগানে। শুরুটা ভাল হল না। গেলেন টালিগঞ্জে। সেখানেই ফুটবলার ষষ্ঠী দুলের পূর্ণতা আসতে শুরু করল। তখনই একটু বেশি পয়সার মুখ দেখতে শুরু করলেন।

তারপর? সামনে, শুধু সামনে এগিয়ে চলা। এলেন ইস্টবেঙ্গলে। এবং তারপরই জীবনটা আমূল বদলে গেল। যা কখনও কল্পনাও করতে পারেননি। একে একে হল সে সবই। গাড়ি, বাড়ি, জমি, মোবাইল। ১৯৯৭-তে সি ই এস সি-তে অস্থায়ী হিসেবে চাকরি শুরু করে এখন স্থায়ী চাকুরে। বলছিলেন, অনেকটাই কৃতজ্ঞ অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে।

ইস্টবেঙ্গলের আশিয়ান জয় ইতিহাস। সেই ইতিহাস তৈরিতে বিরাট অবদান ষষ্ঠীর। চাইম্যানের মতো এশিয়ার প্রথম সারির ফুটবলারকে বোতলবন্দী করে দিয়েছিলেন। সুভাষের হাতে ঝকঝকে, ঝলমলে হয়ে উঠলেন।

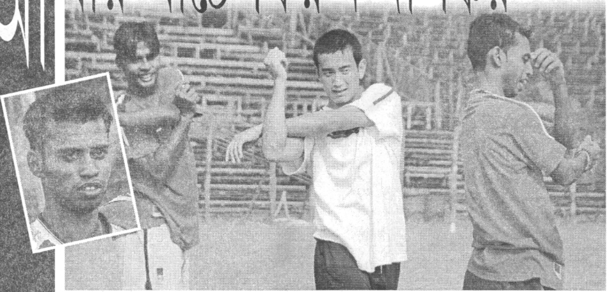
মাঝে জাতীয় দল থেকে উপেক্ষিত হয়ে বাদ পড়ে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন। অভিমানে জানিয়েও দেন আর খেলব না জাতীয় দলে। খেলব শুধু ক্লাবেই। তবে ভেঙে পড়েননি। ষষ্ঠীরা বোধহয় ভেঙে পড়েন না।

প্রচার আর গ্ল্যামারের আলোয় যখন ঝলমল করছেন, না, তখনও একটু বদলাননি ষষ্ঠী। তখনও ভুলতে পারেননি ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। বিশেষ করে কখনও খারাপ খেললে তাঁর পুরনো দিনের কথা বেশি মনে পড়ে। বলছিলেন, 'ভাবি ফুটবলের জন্যই তো আজ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই। যা একসময় ছিল স্বপ্ন।' হ্যাঁ, সত্যিই রূপকথার মতোই উত্থান ষষ্ঠী দুলের।

নায়ক হয়েও একই রকম সাদাসিধে। বিরাট সংবর্ধনায় আগ্রহ নেই। তবে ছোটবেলার ক্লাব চণ্ডীমাতার সদস্য খেটে-খাওয়া মানুষরা যখন তাঁদের প্রিয়, আদরের, গর্বের ষষ্ঠীকে স্মারক উপহার তুলে দিয়েছিলেন, তখন ষষ্ঠী অন্যরকম এক আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন।

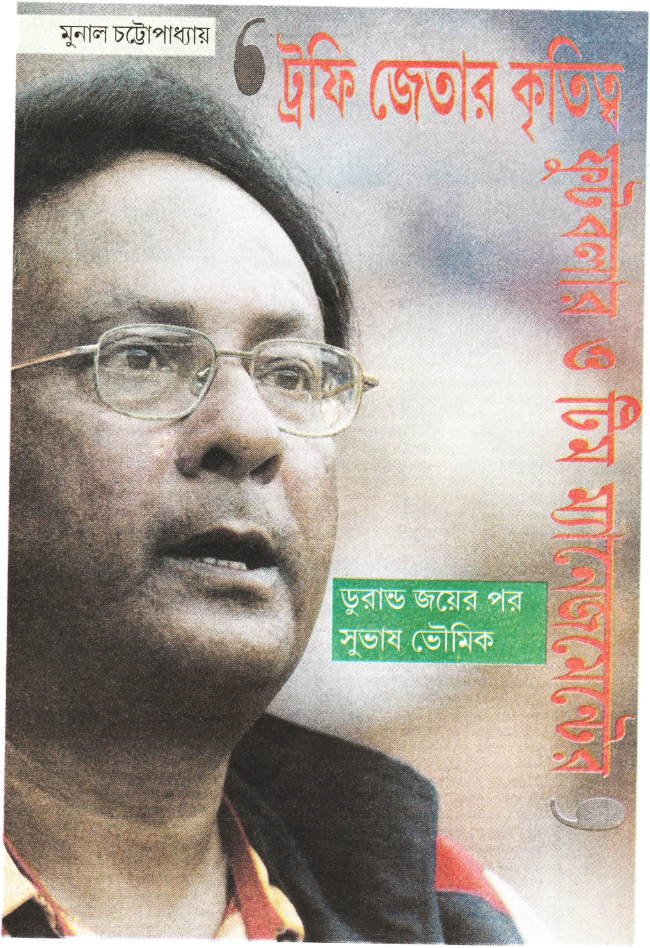
গলি থেকে রাজপথে এসে গভীর অন্ধকার থেকে আলোর ঝলকানিতে ভেসে যাওয়ার দিনে হঠাৎই এ এক কী বিপর্যয়! থমকে গেছে বাংলার ক্রীড়ামহল। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে, সমাজবিরোধীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে হাজতবাস করতে হল কিনা ফুটবলার ষষ্ঠী দুলেকে! অভিযোগ, অপরাধ কতটা, সেটা বিচারের ভার প্রশাসনের, আমাদের শুধু এক রূপকথার নায়কের ট্র্যাজেডি বেদনায় ভরিয়ে দিয়ে গেল। মারাদোনার জন্য কেঁদেছে গোটা বিশ্ব। ষষ্ঠী-দীপঙ্করের পরিণতিতে আমাদেরও চোখে যে জল! আমাদের সমবেত প্রার্থনা, ফিরে আসুন, ওঁরা ফিরে আসুন স্বমহিমায়।

আবার মাঠে ফিরুন দীপঙ্কর



অভিষেক সেনগুপ্ত

আজকালের প্রতিবেদন: হতদরিদ্র ঘর থেকে উঠে আসা দুই ছেলের গল্প। দুজনেরই বাসনা, নামকরা ফুটবলার হবেন। কিন্তু সামর্থ্য? ময়দানের ক্লাবতাঁবুই হয়ে উঠল তাঁদের আশ্রয়। ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার পাহাড়কে পিছনে ফেলে পায়ের শিল্প দিয়ে হলেন ময়দানের 'হিরো'। মোটামুটি ছিমছাম গল্প। ঠিক এর মাঝেই রোমহর্ষক পটপরিবর্তন! দুই শিল্পী জড়িয়ে পড়লেন কুখ্যাত অপরাধীর সঙ্গে। এঁদেরই একজনের বাড়ি থেকে পাওয়া গেল ওই অপরাধীকে। অন্য ফুটবলার মাধ্যমের কাজ করলেন।
এই পর্যন্ত ঘটনা টানলেই পাঠককুল বুঝে যাবেন 'ইন্ট্রো'র মধ্যে থাকা 'দুই শিল্পী-ফুটবলার' নিছক গল্পের নায়ক নন। বাস্তবকে প্রায় হার মানিয়ে দেওয়া ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সি পরে বহু কঠিন ম্যাচ জেতানো দুই ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে ও দীপঙ্কর রায়।
এই দুজন ফুটবলারকে নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠা ময়দানও সম্ভবত এই প্রথম মুখোমুখি হল এই কঠিন রূঢ়তার সঙ্গে। কিন্তু পাঠক, আপনি তো বহুবার ছুটে গেছেন যুবভারতীতে। বহুবার দৌড়েছেন ইস্টবেঙ্গল মাঠে। হয়ত বা কখনওসখনও বিমানবন্দরেও। আপনার ফুটবলার-নায়ক দীপঙ্করকে দেখতে। দীপঙ্কর যখন গোল করেছেন তখন আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আপনার মুখ। দীপঙ্কর হাতকাটা দিলীপের বন্ধু। এখন হয়ত মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও যদি মনে পড়ে যায়, কত কঠিন ম্যাচ জিতিয়েছেন দীপঙ্কর রায়! তা হলে হয়ত মাঠের বাইরে জড়িয়ে পড়া এই ঘটনাকে ভুলতেই চাইবেন। পাঁচ ছুঁইছুঁই কিংবা মেরেকেটে পাঁচ ফুটই হবে হয়ত। বাঁশদ্রোণীর নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান দীপঙ্করের শৈশবচিন্তা বলাবাহুল্য ফুটবলই ছিল। দমকলকর্মী রতন রায় ভাবেননি ছেলে ফুটবলার হবে। তাই বারবার বলতেন ছেলেকে, পড়াশোনাতেই মন দাও। কিন্তু বইয়ের পাতায় যাঁর মন টেকে না তিনি ফুটবলার ছাড়া আর কী হবেন?
শৈশবটা কেটেছে নাকতলায় প্রয়াত শিল্পী-ফুটবলার কৃশানু দে-র বাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরের এক ভাড়াবাড়িতে। পাঁচ-সাত বছরের দীপঙ্কর প্রায়ই দেখতেন কৃশানুকে। পাড়ার বড়দের কাছে প্রয়াত শিল্পীর গুণগান শুনতে শুনতে একসময় ফুটবলই মনের রাজ্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। বয়স বাড়তে বাড়তে প্রবল বাসনাটাই শেষ পর্যন্ত মাঠমুখী করে তুলেছিল দীপঙ্করকে।
ফুটবলের হাতেখড়ি প্রহ্লাদ সেনগুপ্তের কোচিং ক্যাম্পে। প্রথম দিনই দীপঙ্করকে দেখে প্রহ্লাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, একটু ঘষেমেজে নিলে ওই নিরেট হীরেটা ময়দানের সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কারগুলোর পাশে শোভা পাবে। ওই ঘষামাজার দিনগুলোতেই পিয়ারলেস ট্রফিতে নজর কাড়েন দীপঙ্কর। মাঝমাঠের ফুটবলারটি সেদিন মোহিত করে ফেলেছিলেন টাটা ফুটবল আকাদেমির নির্বাচকদের। সেখানে কোচ মহম্মদ হাবিবের সংস্পর্শে জীবন বদলে যায় তাঁর। দীপঙ্কর নিজেও সব সময় স্বীকার করেন প্রহ্লাদ আর হাবিবের অবদানের কথা। দিনকে দিন সাফল্যের শিখরে উঠতে থাকেন দীপঙ্কর।
৯৬ সালে টি এফ এ-তে যাওয়া দীপঙ্কর ৯৯-এ ডাক পান জে সি টি থেকে। ওই বছরেই ডুরান্ডে বি এস এফের বিরুদ্ধে অনবদ্য ৩ গোল করেন দীপঙ্কর। এরপরই জীবনের মোড় ঘুরে যায় বাঁশদ্রোণীর নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেটির। মিলন সমিতিতে ফুটবলজীবন শুরু করা দীপঙ্কর ডাক পান ইস্টবেঙ্গল থেকে।
লাল-হলুদ শিবিরে এসে সাফল্যের সঙ্গে সহাবস্থান করতে থাকেন। একের পর এক ম্যাচ খেলে তিনি জায়গা পান সমর্থকদের মনে। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালে ইংল্যান্ডে শুভেচ্ছা সফরে ডাক পান ভারতীয় দলে। কিন্তু দলের অপরিহার্য দীপঙ্করকে ছাড়া হয়নি ক্লাব থেকে। এই দুঃখটা বোধহয় মনের কোনও এক জায়গায় জমে পাথর হয়ে রয়েছে দীপঙ্করের। এর সঙ্গে হয়ত মিশ্রণ ঘটেছে আশিয়ান কাপ খেলতে না যেতে পারার দুঃখটাও। কিন্তু মিডফিল্ডারটি যতবারই সুযোগ পেয়েছেন ম্যাচ পৌঁছে গেছে অন্য মাত্রায়। ছোটবেলা থেকে দীপঙ্করের লক্ষ্য কৃশানু দে-র মতো দেশের মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা পেতে। ফুটবলপ্রেমীরাও বোধহয় তাই চান। ঝড়ঝাপ্টা কাটিয়ে দীপঙ্কর ফুটবল দিয়ে আবার জয় করে নিক মানুষের মন।


মুনাল চট্টোপাধ্যায়
‘ট্রফি জেতার কৃতিত্ব
ফুটবলার ও টিম ম্যানেজমেন্টের’
ডুরান্ড জয়ের পর
সুভাষ ভৌমিক

দিল্লিতে পৌঁছেই প্রচারমাধ্যমকে ফাইনালের আগের দিন বলেছিলাম, ছন্দময় ফুটবল চাই না, ট্রফি জিততে চাই। কারণ এর আগে এই ডুরান্ডেই ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেও ট্রফি জিততে পারিনি। অসংখ্য গোলের সুযোগ তৈরি করে, তা হেলায় হারিয়ে টাইব্রেকারে ম্যাচ খুইয়ে কলকাতা ফিরতে হয়েছিল



প্রঃ ডুরান্ড জয়ের পর আপনার অনুভূতি কী?

সুভাষ : এই ট্রফিটা খুব দরকার ছিল, জয়টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ক্লাব, সদস্য, সমর্থক, ফুটবলাররা একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। দমবন্ধ করা সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি ছিল এই ট্রফি জেতা। এখন আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করে পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য এগোন যাবে। তা ছাড়া এ এফ সি কাপটা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে সদস্য সমর্থকদের বলেছিলাম যে ট্রফি জেতার লক্ষ্যে ঝাঁপাব। শিল্ডটা হাতছাড়া হলেও ডুরান্ড ঘরে এসেছে। খেলোয়াড় জীবনে আমি একবার ডুরান্ড জিতেছি। কোচ হিসেবে দু'বার জিতলাম।

প্রঃ এটাই প্রথম এমন হল, যখন গোটা প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র ফাইনাল ছাড়া আপনি কখনও দলের সঙ্গে ছিলেন না। এতে ফাইনালে আপনাকে মোহনবাগানের মুখোমুখি হতে সমস্যা হয়নি?

সুভাষঃ আমার শরীর ভাল ছিল না। তা ছাড়া ক্লাবও দুই ফুটবলারকে নিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে ছিল। তাই দলের সঙ্গে আগে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি ফাইনালেও আসতাম না। কিন্তু আমার টিম ম্যানেজমেন্ট, ফুটবলাররা বারবার বলল ফাইনালে আপনি আসুন। আপনি থাকলে আমরা বাড়তি উৎসাহ পাব। তাই আমি এসেছিলাম। এসে ওদের স্পষ্টই বলেছিলাম, তোমরা নিজেদের কৃতিত্বে, চেষ্টায় ফাইনালে উঠেছ। তোমরা আমার পরামর্শ চাইলে নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু ডুরান্ড জয়ের পর একটা কথাই বলব ট্রফি জেতার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ দিল্লিতে থাকা ফুটবলার ও টিম ম্যানেজমেন্টের। ওরাই তো দলটাকে ফাইনালে তুলেছিল। চ্যাম্পিয়নও করেছে। আমি এই দলের একজন সদস্য মাত্র। সবচেয়ে খুশি হয়েছি বিকাশ পাঁজি সেরা কোচ হওয়ায়।

প্রঃ আপনার দল একটা চমৎকার ছন্দময় ফুটবল খেলে। অথচ ডুরান্ড ফাইনালে খেলল গুটিয়ে থাকা ফুটবল। এটা কেন?

সুভাষঃ আমি দিল্লিতে পৌঁছেই প্রচারমাধ্যমকে ফাইনালের আগের দিন বলেছিলাম, ছন্দময় ফুটবল চাই না, ট্রফি জিততে চাই। কারণ এর আগে এই ডুরান্ডেই ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেও ট্রফি জিততে পারিনি। অসংখ্য গোলের সুযোগ তৈরি করে, তা হেলায় হারিয়ে টাইব্রেকারে ম্যাচ খুইয়ে কলকাতা ফিরতে হয়েছিল। তাই এবার এসেই ফুটবলারদের বলেছিলাম, তোমরা ছন্দময় ফুটবল খেলার জায়গাতেও নেই। তোমাদের আরও গোছাতে হবে নিজেদের। তাই পুরো বাংলা ফুটবল খেল। প্রতিপক্ষকে ওপেন করতে দিও না। আর নিজেদের অর্ধে বল এলেই উড়িয়ে দাও। এর মধ্যে প্রতি আক্রমণে দু-একটা সুযোগ পেলে কাজে লাগাও। সেই পরিকল্পনাটা খেটে গেছে। দুটো মাত্র



মোহনবাগানের সঙ্গে গত তিনটি ম্যাচেই আমার দলের আধিপত্য ছিল। শিল্ডে দশজন না হয়ে গেলে ম্যাচটা টাইব্রেকারের আগেই শেষ করে দিতাম। টাইব্রেকারে হেরে যাই। তাতে ফুটবলারদের বলেছিলাম পরে দেখা হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। জেতা আটকাবে না

সুযোগ থেকেই বাজিমাত।

প্রঃ কখনও মনে হয়েছিল ম্যাচটা হেরে যেতে পারেন?

সুভাষ : না, আমার কোনও টেনশন ছিল না। কারণ মোহনবাগানের সঙ্গে গত তিনটি ম্যাচেই আমার দলের আধিপত্য ছিল। শিল্ডে দশজন না হয়ে গেলে ম্যাচটা টাইব্রেকারের আগেই শেষ করে দিতাম। টাইব্রেকারে হেরে যাই। তাতে ফুটবলারদের বলেছিলাম পরে দেখা হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। জেতা আটকাবে না। আটকায়নি এখানে। ডগলাস নিজ গোলে বল পাঠানোতেই ঘাবড়ায়নি এই কারণে আমার ছেলেরা। বলেছিলাম, ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালেই বা ক্ষতি কী? এমন একটা পরিস্থিতিতে দল যে ফাইনাল খেলছে এটাই বড় ব্যাপার। ম্যাচটা উপভোগ কর, এতেই কোনও চাপ ছিল না। আর তাই চন্দনের পা থেকে শেষ মুহূর্তে এমন বিশ্বমানের গোল বেরিয়েছে।

প্রঃ ষষ্ঠী দুলে-দীপঙ্কর রায়দের জন্য এ সময় কী বলবেন?

সুভাষ : আমি ওদের কিছু বলব না। আমি শুধু এখানে থাকা ফুটবলারদের ম্যাচের আগে বলেছিলাম, তোমাদের পরিচিতি, সম্মান ফুটবলার হিসেবে। মাঠে সেটা প্রমাণ কর। ট্রফিটা জেত ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের জন্য। এবং ওদের ভাবতে বাধ্য কর, শেখাও যে তোদের জন্য এত কষ্ট করে ট্রফিটা জিতেছি, এমন মারাত্মক ভুল যেন জীবনে আর দ্বিতীয়বার তোরা করিস না।

প্রঃ ডুরান্ড জয়ের পর কার কার বিশেষ অভিনন্দন পেলেন?

সুভাষ : বাইচুং, বিজয়ন, তুষার ছাড়া আরও অসংখ্য মানুষের, যাঁরা আমাকে ভালবাসেন।

প্রঃ পরবর্তী লক্ষ্য কী?

সুভাষ : অবশ্যই প্রথমে লিগ জয়। ১৪ তারিখ থেকে অনুশীলনে নেমে পড়ব। তারপর ফেডারেশন কাপ। এবং সবশেষে জাতীয় লিগে আরও ভাল করার চেষ্টা করব। মাঝে সুপার কাপটা হলে এটাও জিততে চাই।

প্রঃ বাইচুং-এর চোট কেমন?

সুভাষ : আসলে ওর চিকিৎসাটা ঠিকমতো হয়নি। অতেই একটা সমস্যা রয়ে গেছে। তবে এখন ঠিক হওয়ার পথে। ফেডারেশন কাপের আগে লিগে খেলিয়ে তৈরি করে নিতে চাই। বাইচুং ছাড়াও জাতীয় লিগে দলে সুরেশ, সুভাষের মতো আরও কয়েকজন ফুটবলার এসে যাবে। তখন দলটা আরও শক্তপোক্ত হবে।

প্রঃ বর্তমানে দলে যে বিদেশি আছে তাতে সন্তুষ্ট?

সুভাষ : অবশ্যই। জেরেমায়া, পাওলো দুজনেই কার্যকরী ফুটবলার। ডগলাস এতদিন ভাল ফুটবল খেলে এসেছে। এপর যদি মাইক ওকোরো এসে যায় তাহলে তো কথাই নেই।

প্রঃ লাল কার্ড দেখায় মাধবকে কী বললেন?

সুভাষ : ওটা আমার দলের ভেতরের ব্যাপার। তবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সব ফুটবলারেরই দলের কথা ভেবে নিজের মানসিকতা ঠিক রাখা জরুরি।

প্রঃ স্টিফেন তো শীঘ্রই বিদায় নেবেন। সে জায়গায় আপনাকে যদি কোচ করা হয় দায়িত্ব নেবেন?

সুভাষ : আমি আগ্রহী নই। আমি ক্লাব কোচিং-এ যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি।

ফেডারেশন কাপের লক্ষ্যে

তৈরি হচ্ছেন জেরেমায়া





সোমনাথ দাস
দিল্লি

প্রথম ম্যাচেই বাজিমাত। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়ে ডুরান্ড কাপে অভিষেক ম্যাচেই গোয়ার ডি স্পোর্টিংকে ৩ গোল। জুনিয়রের শোক ভুলে লাল-হলুদ সমর্থকরা এখন ইস্টবেঙ্গলের নতুন নায়ককে নিয়ে মেতে উঠেছেন। ডুরান্ড সেমিফাইনালে ও ফাইনালে গোল না পেলেও লম্বা চেহারার জেরেমায়ার মাঠে উজ্জ্বল উপস্থিতি স্বপ্ন দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। নাইজেরিয়ার এই ফুটবলার কিছুদিন আগেও ছিলেন প্রচারের আলোর বাইরে। কিন্তু বড় ক্লাবে অভিষেকেই সাফল্য বদলে দিয়েছে অনেক কিছু। উৎসুক সাংবাদিকদের ভিড় বেড়েছে। ফাইনালের আগে কিছুতেই কথা বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'খেলা'র সাক্ষাৎকার দিতে বসলেন। সাদা জার্সি ও সবুজ ট্র্যাকস্যুট পরা লম্বা চেহারার জেরেমায়াকে দেখলে কিছুতেই মনে হবে না তিনি এখনও 'টিন এজ' পার হয়নি। প্রশ্নের জবাবে হাসতে হাসতে জেরেমায়া জানালেন তাঁর বয়স এখন মাত্র ১৯। ছটফট ও আমুদে এই স্টাইকার প্রথম খেলা শুরু করেছিলেন নাইজেরিয়ার লোগান স্টেশনারি ক্লাবে। নাইজেরিয়ার লোগাস প্রদেশের ছেলে জেরেমায়ার ফুটবল জীবন শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। প্রথমে লোগান স্টেশনারি ক্লাব তারপর কুতনুর ড্রাগন এফ সি ক্লাব। সেই সময় ড্রাগন এফ সি-তে খেলতেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে। হঠাৎ করেই ভারত থেকে এভাররেডির প্রস্তাব পান এক এজেন্টের মাধ্যমে। অমল দত্ত সেই সময় সদ্য কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন এভাররেডিতে। তাঁর নির্দেশে হন্যে হয়ে বিদেশি ফুটবলার খুঁজছিলেন এভাররেডি কর্তা নবাব। অবশেষে নবাবের হাত ধরে কলকাতায় এলেন জেরেমায়া। সময়টা ২০০৩ সালের মাঝামাঝি। বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতেই অমল দত্ত ঠিক করলেন জেরেমায়াকে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলাবেন। স্ট্রাইকার হিসেবে জেরেমায়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ময়দানে নিজের জাত চেনালেন খুব কম সময়ে। তাঁর পারফরমেন্সের জোরেই এভাররেডি ময়দানের একটি 'কুখ্যাত' টুর্নামেন্ট জিতল। আই এফ এ শিল্ড সেমিফাইনালেও পৌঁছেছিল এভাররেডি। কিন্তু জাতীয় লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের মূলপর্বে ওঠার পরই চোট। এরপর দীর্ঘ সময় পর জেরেমায়ার মাঠে ফেরো। এবং অবশ্যই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। ১৯৬৬ সালে শ্যাম থাপাও এভাবেই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়ে অভিষেক ম্যাচে ৩ গোল করেছিলেন। চোট আঘাতে বিপর্যস্ত জেরেমায়া এ বছর অধিকাংশ সময়টাই ময়দানের বাইরে ছিলেন। কিন্তু এভাবে ফিরতে পেরে ভীষণ খুশি জেরেমায়া জানালেন, 'ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে যে ভুল করিনি সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গলকে আরও সাফল্য দিতে চাই। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল ভাল খেলা। এখন মন দিয়ে শুধু সেটাই করতে চাই। কিছুদিন আগে জেরেমায়াকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ও এভাররেডি দুই ক্লাবেই টানাটানি চলছিল। জেরেমায়া এভাররেডি ছাড়ার আগেই ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের সঙ্গে অনুশীলন করেন। সেই নিয়ে চলে একপ্রস্থ বিতর্ক। সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই জেরেমায়া অবশ্য এড়িয়ে গেলেন, 'আমি ইস্টবেঙ্গলেই খেলতে চেয়েছিলাম। ওই ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাই না। এখন আমি শুধু ইস্টবেঙ্গল নিয়েই ভাবছি।' নাইজেরিয়ার ওকোচার ভক্ত জেরেমায়ার কাছে ফুটবলের মাধুর্য গতি ও শক্তিতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জেরেমায়ার আদর্শ অবশ্য থিয়রি অঁরি। 'ওঁর গতি, শক্তি আর পাসিংয়ের স্টাইল আমাকে দারুণ আকর্ষণ করে।' জানালেন জেরেমায়া। কলকাতা লিগ শেষ হওয়ার আগেই ক্লাব বদল। তাই লিগের বাকি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে পারবেন না। সেজন্য আক্ষেপ রয়েছে কিন্তু ফেডারেশন কাপে সুদে-আসলে সেই আফসোসটা মিটিয়ে নিতে চান। লাল-হলুদ শিবিরের নয়নের মণি এখন ফেডারেশন কাপের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন।

প্রতিদানটা মাঠেই দিতে হবে

ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের

দেবজিৎ ঘোষ

৯৭-এ মোহনবাগানে প্রথম দেখি ষষ্ঠীকে। জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে এসেছিল। বাচ্চা ছেলে। গরিব ঘর থেকে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমার তো বটেই, সকলেরই একটা বাড়তি স্নেহ ও সহানুভূতি ওর জন্য ছিল। উচ্চতাটা কম। তাই নিয়ে নানা কথা হত। অনেককেই বলতে শুনেছি, এত কম উচ্চতা নিয়ে বড় ফুটবলার হওয়া সম্ভব নয়। ষষ্ঠী কিন্তু তাদের ভুল প্রমাণ করেছে। উচ্চতা কম নিয়েও আন্তর্জাতিক স্তরের ফুটবলেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ওর দক্ষতা দিয়ে। ৯৭-৯৮-এ মোহনবাগানে তেমন খেলার সুযোগ পায়নি। চলে যায় টালিগঞ্জে। ওখান থেকেই ওর উত্থানের শুরু। বড় দল ওকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়। ২০০২-এ ইস্টবেঙ্গলে আসার পর থেকে ওকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আর দীপঙ্করকে প্রথম দেখি ৯৮-এ। মোহনবাগানের হয়ে জাতীয় লিগে সুপার সিক্স ম্যাচ খেলতে গোয়া যাই। জে সি টি-র বিরুদ্ধে খেলা। ছটফটে দীপঙ্কর ছিল ওই দলে। বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই বাসুদেবের পর যে কোনও সাইড ব্যাককে নাজেহাল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে দীপঙ্কর ওর দৌড়, ক্রীড়ানৈপুণ্য দিয়ে। পরের বছরই ইস্টবেঙ্গলে সই করে। যতদিন দীপঙ্কর আমার বিরুদ্ধে খেলেছে, ততদিনই ওকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে হয়েছে আমাকে। দীপঙ্কর, ষষ্ঠী, চন্দনরা এত প্রতিভাবান যে ওরা নিজেরা সিরিয়াস থাকলে এদের বসানো খুব কঠিন। এই সিরিয়াসনেসের অভাবটাই শুধু ছিল দীপঙ্করের মধ্যে। অন্য কোনওরকম দোষত্রুটি চোখে পড়েনি। ষষ্ঠী-দীপঙ্কর এই দুটো ছেলে আমাদের সব সময় হাসিঠাট্টায় মাতিয়ে রাখত। হয়ত ম্যাচে হেরে গেছি, প্রচণ্ড মন খারাপ। তখন ষষ্ঠী এমন সব কথা বলত যে, না হেসে থাকা যেত না, মনটা নিমেষে হালকা হয়ে যেত। কখনও কোচ হয়ত বকছে ষষ্ঠীকে, তখন এমন একটা মন্তব্য করে বসত, যাতে কোচের রাগও জল হয়ে যেত। আশিয়ান কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালে ওঠার পর একটা গান মুখে মুখে। আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম ষষ্ঠীর গান বানানোর ক্ষমতা দেখে। এ ছাড়া মনে আছে এশিয়ান গেমসের শিবিরে ষষ্ঠী আমার সঙ্গে ছিল এই দিল্লিতেই। একদিন আমার কাছে এসে বলল, দেবুদা আমি কিছু 'এনডিউরেন্স প্র্যাকটিস' বানিয়েছি। দেখবে? দেখলাম একটা খাতায় ও প্র্যাকটিসগুলো এঁকেছে। সেদিনই বুঝেছিলাম ফুটবল নিয়ে ও কতটা ভাবে? কখনও বই পড়েনি। ফুটবলের স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনাও করেনি। কিন্তু শুধু বিভিন্ন কোচের প্র্যাকটিস আর টিভিতে খেলা দেখে এতটা ভেবেছে। এটা কি





কম প্রতিভা নাকি? এমনকি ষষ্ঠীকে কখনও লোকের উপকারের জন্য ছাড়া নিজের জন্য ওপরমহলে যেতে শুনিনি। হয়ত ষষ্ঠীকে দেখা যাচ্ছে অনুশীলনের পর তাড়াতাড়ি বেরোতে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী ব্যাপার? ষষ্ঠী বলেছিল, একটা ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। একটা ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা অমুক আকাদেমির দশটা বল দরকার। তারই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। এরকম একটা ছেলে এভাবে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। আমি এখনও মনে করি ষষ্ঠী-দীপঙ্করের সরল মানসিকতার ও বিশ্বাসের জন্যই ওরা ফেঁসে গেছে। আগেই বলেছি, দীপঙ্করের মধ্যে সিরিয়াসনেসের অভাব ছিল। ও যে দলের একজন সিনিয়র ফুটবলার সেটা ওর মাথায় ঢুকত না। এই ছেলেমানুষিটাই ওর বিপদে জড়িয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ দীপঙ্করকে কখনও মুখে হাসি ছাড়া দেখিনি। এমনকি সবাই যখন গালাগালি করছে, তখনও ও হাসে। আসলে বয়সটাই শুধু বেড়েছে দীপঙ্কর, ষষ্ঠীদের। ওরা যথেষ্ট পরিণত নয়। দীপঙ্কর, ষষ্ঠী, চন্দন, দীপকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অন্যদের তুলনায় বেশিই। এরা প্রত্যেকে এমনই যে, কখনও দলের ক্ষতি চায় না, না খেলালেও ওরা রাগে না, দলের হার প্রার্থনা করে না। দুটো ছেলে ষষ্ঠী ও দীপঙ্কর কীভাবে জড়িয়ে গেল অপরাধ জগতের সঙ্গে, সেটা রহস্যই থেকে গেল আমার কাছে। তবে এটা জেনে খুব ভাল লাগছে ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অসংখ্য মানুষ। ওঁদের মধ্যে ক্রীড়ামোদী দর্শক ছাড়াও রাজনীতিবিদরাও আছেন। পথসভা হয়েছে। কোচ, বাইচুং, ক্লাব সব সময় ওদের সঙ্গে রয়েছে। বিশেষ করে ক্লাব যেভাবে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে তা ভাবাই যায় না। এটা সব ফুটবলারকেই বাড়তি সাহস ও ভরসা জোগাচ্ছে। বিপদে পড়লে ক্লাব পাশে থাকবে এটার জন্যই সবাই সেরাটা দেবে মাঠে। যদি সত্যি কোনও দোষ করে তাকে, তাহলে ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের বোঝা উচিত, ভবিষ্যতে কীভাবে চলা দরকার। নিম্ন মধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যারা উঠে আসে, তাদের আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত প্রতিটা পা ফেলার ব্যাপারে। তবে ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের সত্যি কতটা দোষী বা দায়ী গোটা ঘটনার জন্য তা আমারও সন্দেহ আছে। এটুকু বলতে চাই, ওরা কেউ দাগি আসামি নয়, তাই ওদের সঙ্গে যেন সেভাবেই ব্যবহার করা উচিত। ওরা দ্রুত ছাড়া পেয়ে মাঠে ফিরুক, এটাই প্রার্থনা করি। আমরা একশোভাগ ওদের সাহায্য করব সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে, যদি ওরা কোনও ভুল সত্যি করে থাকে। ক্লাব যে সমর্থন ওদের দিচ্ছে, তার দরুন ষষ্ঠী-দীপঙ্করদের প্রতিদানটা দিতে হবে মাঠে খেলেই। ওদের আসল পরিচয় হল ওরা ফুটবলার। মাঝের সময়টুকু শুধুই দুঃস্বপ্ন।



লেখাপড়ার বাইরে

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

স্বপ্নপথের যাত্রী 'সোদপুর হাইস্কুল'



প্রত্যেক মানুষের মতো, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরও ইতিহাস থাকে। যে সব প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামের, প্রতিকূলতার, দ্বন্দ্বের পথ পেরোনোর ইতিহাস থাকে, তারা ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অনেক সুচারুভাবে। সোদপুর হাইস্কুলও এমন একটি প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রসারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ১৮৫৩ সালের ৪ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর নিজস্ব জমিতে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে প্রধান শিক্ষকের নাম হিসেবে নাটাগড়ের চন্দ্রনাথ রায়ের নাম পাওয়া যায়, যিনি পরবর্তীকালে জয়পুর মহারাজার অধীনে চাকুরি নিয়ে চলে যান এবং তাঁর জায়গায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হন। এই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়েই এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি কপিলাবস্তুর আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পারিবারিক বিবাদের কারণে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দমদমের দুঃখীরাম ঘোষের জমি কিনে স্কুল স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। ১৮৬৮ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন শেষ পদকটি পর্যন্ত তিনি স্কুলের উন্নতিতে ব্যয় করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ঊষাঙ্গিনী তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এই বিদ্যালয়ের পাকা ভিত তৈরির জন্য দান করেন। কেদারনাথবাবুর পর নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দু দশক ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোদপুরের সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও স্কুলটি চালিয়েছিলেন। এরপর স্কুলের হাল ধরেছিলেন অনাদিভূষণ ভট্টাচার্য। সেই থেকে স্কুল চলেছে তার নিজের নিয়মে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের পদে রয়েছেন দেবাশিস মুখার্জি। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের খেলাধুলো সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ও সচেতন। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ না থাকাটা এখন আর কোনও নতুন সমস্যা নয়। এ ক্ষেত্রে স্কুলগুলো আশপাশের ক্লাবের মাঠ ধার করে কাজ চালায়। কিন্তু স্কুলের যদি একটা নিজস্ব জিমনাসিয়াম থাকে, তাহলে সেটা সকল ছাত্রের পক্ষেই অত্যন্ত উপযোগী হয়। সেই অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক জিমনাসিয়ামের জমির জন্য স্থানীয় বিধায়ককে আবেদনও জানিয়ে রেখেছেন, সে আবেদন মঞ্জুর হলে, ছেলেরা খেলাধুলোয় আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করেন স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক দেবাশিস রায়। তিনি নিজে একটা সময় মৌরি স্পোর্টিং ও অ্যালবার্ট ক্লাবে ফুটবল খেলেছেন, কোচিংয়ে এন আই এস ডিগ্রিও তাঁর আছে। ছেলেদের খেলাধুলো নিয়ে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। কিন্তু স্কুলের চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পরেই তাঁর



প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ক্রীড়া শিক্ষক ও সহশিক্ষকরা।

উৎসাহ বড়মাপের ধাক্কা খেয়েছিল। সে ধাক্কা এসেছিল রনজি খেলেছেন এমন এক ক্রিকেটারের কাছ থেকে। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। ছেলেদের নিয়ে দেবাশিসবাবু গিয়েছিলেন মাইলো কাপে যোগ দিতে। খেলা শুরুর আগে, উদ্যোক্তারা সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন যে, তাঁদের এই টুর্নামেন্টের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল প্রতিভার অনুসন্ধান। প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচে দেখা গেল, সোদপুর স্কুলের এগেনস্টে খেলতে নামা সত্যভারতী স্কুলের এগারো জনের মধ্যে পাঁচ জনই কলেজপড়ুয়া। দেবাশিসবাবুরা এই অন্যায়ের লিখিত প্রতিবাদ

জানালেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রমাণপত্রও সংগ্রহ করে এনে দিলেন। কিন্তু তার ফল হল উল্টো। ওই সব অবৈধ খেলোয়াড়ের নাম বাতিল হওয়া দূরে থাক, সংগঠনের দায়িত্বে থাকা এক নামী ক্রিকেটার (প্রাক্তন রনজি ট্রফি খেলোয়াড়) উল্টে দেবাশিসবাবুকে খেলার পরিবেশ নষ্ট করছেন বলে দোষারোপ করলেন। ফলে ওই টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিলেন দেবাশিসবাবুরা। পরে আরও কয়েকটি স্কুল ওই একই প্রতিবাদে সামিল হয়ে নাম তুলে নিল। এরপর অবশ্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু কাকে ক্ষমা করা হবে? একটা অন্যায় প্রশ্রয় পেতে পেতে আজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সৎ শিক্ষকরাও মনে করছেন, এই সব টুর্নামেন্ট মানেই হল দুর্নীতি। আর এই অসম লড়াইয়ে হেরে ফিরে আসা ছেলেরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুশিক্ষিত হওয়াটাই খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ। টুর্নামেন্টে সেভাবে যোগ না দিলেও সুমহান দাশগুপ্ত, দেবাশিস রায়, সঙ্ঘমিত্র ভট্টাচার্যরা ছাত্রদের খেলাধুলোর ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সাহায্য করেন। দুঃস্থ অথচ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সাহায্য করার জন্য শিক্ষকরা সবাই মিলে একটা তহবিল গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছেন। সৎ প্রচেষ্টা বিফল হয় না কখনও, এ কথা নিশ্চয়ই একদিন প্রমাণ করে দেবে শতাব্দী প্রাচীন এই স্কুলটি— অন্তত এটাই সোদপুর হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্তরিক বিশ্বাসের সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

উইকেটকিপিং করতেই ভাল লাগে



সমন্বয় চক্রবর্তী: (প্রথম স্থানাধিকারী)— আমরা সোদপুর এইচ বি টাউনের বাসিন্দা। আমার বাবা ফরেস্ট অফিসার, আর দিদি কলেজে পড়ে। আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা, তাই পড়াশোনার চাপটাও একটু বেশি। তবুও ইন্ডিয়ার খেলা থাকলে (বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ) টিভি-র সামনে বসে যাই। শচীন খেলছে, অথচ আমি খেলা দেখব না, এটা হতেই পারে না। আমাদের এইচ বি টাউনের মাঠে স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে একটু-আধটু ক্রিকেট খেলি। ব্যাটিং বা বোলিংয়ের চেয়ে উইকেটকিপিং করতে আমার বেশি ভাল লাগে। ক্রিকেটটা শীতকালেই বেশি খেলি আর অন্য সময় ফুটবল খেলি। ফুটবলে আমার প্রিয় দল মোহনবাগান। খেলাধুলোয় অবশ্য আমি খুব একটা পারদর্শী নই। তবুও হঠাৎ কোনওদিন যদি কোনও ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট টিমে চান্স পাই, আর প্লেয়ার হিসেবে নামধাম করতে পারি, তখন খুব মজা হবে। পড়াশোনায় এন্তার ফাঁকি দিলেও কেউ আমাকে কিছু বলবে না, কারণ তখন যে আমি উঠতি ক্রিকেটার।

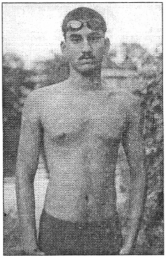
এশিয়াড বা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করাই স্বপ্ন

অতনু শিকদার: আমি তখন খুব ছোট, ক্লাস ওয়ানে পড়ি। আমাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল। প্রতিদিন বিকেলে ছেলেরা সেখানে জিমনাস্টিক প্র্যাকটিস করত। ওদের প্র্যাকটিস করতে দেখে আমারও জিমন্যাস্টিক করতে ইচ্ছা করত। মা আমার এই আগ্রহ দেখে



'ওরিয়েন্টাল ক্লাবে' ভর্তি করে দিলেন। তারপর থেকে একটানা সাত বছর ওখানে জিমন্যাস্টিক শিখেছি। সেখানে আমাদের ট্রেনার ছিলেন বিশ্বজিৎদা। আমার ফ্লোর জিমন্যাস্টিকই বেশি ভাল লাগে। আর হরাইজেন্টাল বার, রিং, ভল্টিং হর্স— এই ইভেন্টগুলোই আমার প্রিয়। এর মধ্যে আমি স্কুলের হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ও স্টেট লেভেলে অংশগ্রহণ করেছি। এর আগে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও আমি প্রথম হয়েছিলাম। বর্তমানে আমি সুখচর শিশু উদ্যান ক্লাবেই রেগুলার প্র্যাকটিস করছি। তবে আগামী বছর আমার 'সাই'তে পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে। আর সেখানে যদি চান্স পাই, তবে একদিন নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার হয়ে এশিয়াড বা অলিম্পিকে যোগ দিতে পারব এই আশা রাখি।

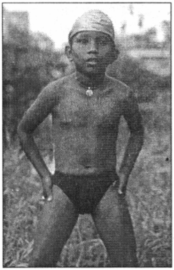
নিজের দেশকে গর্বিত করতে কার না ভাল লাগে ?



উদ্দালক ঘোষ: আমি প্রায় দশ বছর ধরে সাঁতার কাটছি। অথচ সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন প্রথম প্রথম আমার জলে নামতেই ভীষণ ভয় করত। মা যখন আমাকে সাঁতার শেখার জন্যে (তখন আমি ক্লাস টুতে পড়ি) শ্যামনগরের 'অন্নপূর্ণা সুইমিং সেন্টার'-এ ভর্তি করে দিয়েছিলেন, ভয়ে আমি কিছুতেই ক্লাবে যেতে চাইতাম না। আমার বাবার খুব শখ ছিল আমাকে সাঁতারু করার। তাই মা আমায় একরকম জোর করেই ক্লাবে নিয়ে যেতেন। একটা বাঁধানো পুকুরে আমাদের ট্রেনার বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী সাঁতার শেখাতেন। তার পর যেদিন সাঁতরে পুকুরটা পারাপার করতে পারলাম, সেদিন থেকে সব ভয় কেটে গেল। এখন আমি সাঁতার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না। ক্লাস ফোরে পড়াকালীন আমি প্রথমবার ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং কম্পিটিশনে যোগ দিই। তখন আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই থার্ড হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, ফার্স্ট বা সেকেন্ড হলে স্টেট লেভেলের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। পরের বার অবশ্য আমি ৫০ মিঃ ফ্রি স্টাইলে প্রথম হই। সেবারই স্টেট লেভেলে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম। আর ফাইনালে কোয়ালিফাই করলেও কোনও পজিশন পাইনি। এর পর ক্লাস এইটে পড়ার সময়, ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় ন্যাশনালেও অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে থার্ড পজিশন পেলাম। এর পর ২০০২ সালে স্কুলের হয়ে স্টেট লেভেলে আমি রেকর্ড করেছিলাম। আমার সময় ছিল ২৮.৮৪। সেবার পুনায় 'ন্যাশনাল গেমসে' হিটে সেকেন্ড পজিশন পেয়েছিলাম। কিন্তু ফাইনালে অতিরিক্ত টেনশনে ফিফথ হয়ে গেলাম। কিন্তু এবারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি একটা

ইভেন্টে প্রথম, দুটো ইভেন্টে দ্বিতীয় ও আর একটি ইভেন্টে তৃতীয় হওয়া সত্ত্বেও ন্যাশনালে আমার চান্স হল না। অথচ যে ছেলেটি দুটি ইভেন্টে তৃতীয় হয়েছে সে কিন্তু সুযোগ পেয়ে গেল। কেন যে এরকম হল, সেটা আজও পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। তবে এবার যা-ই ঘটুক, আগামীবার আমি নিশ্চয়ই ন্যাশনালে চান্স পাব। বাবা বলেছেন, ভাল করে সাঁতার শেখার জন্য আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাবেন। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সুযোগ না পেলে আমেরিকার ফ্লোরিডায় যাব। আমার সাঁতারের ব্যাপারে স্কুলের স্যারেরা খুব উৎসাহ দেন। অনেক সময় কোনও টুর্নামেন্ট থাকলে কিংবা পরীক্ষা দিতে না পারলে, বিচারকরা গ্রেস মার্কসও দিয়ে দেন। আমি স্বপ্ন দেখি, এশিয়াড ও অলিম্পিক থেকে ভারতকে সাঁতারে পদক এনে দেব। নিজের দেশকে গর্বিত করতে কার না ভাল লাগে বলুন?

বড় হয়ে বুলাদিদির মতো ইংলিশ চ্যানেল পার হতে চাই



অরিজিৎ ঘোষ: আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। গত বছর (২০০৩ সালে) মুর্শিদাবাদে ১৯ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে প্রতিযোগীদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবার চেয়ে ছোট। মোট ছিয়াশিজন প্রতিযোগীর মধ্যে আমি বাইশতম স্থান পেয়েছিলাম। আমার স্কুলের স্যারেরা খুব ভাল, ওরা আমাকে ভালবাসেন আর সাঁতার কাটতে বলেন। এ বছরও আমি মুর্শিদাবাদের সেই ১৯ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলাম। এবারে ১২৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে আমি সাতাশতম স্থান পেয়েছি। পরের বছর আমি ৮১ কিমি-র প্রতিযোগিতায় নাম দেব। বড় দূরত্বের এই সাঁতার প্রতিযোগিতাগুলোতে আমার একটাই অসুবিধে হয়, চোখে বালি ঢুকে যায়। ফলে চোখ কড়কড় করে, তখন সাঁতার কাটতে কষ্ট হয়। ছোট দূরত্বের প্রতিযোগিতাগুলোয় এই সমস্যা নেই। আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় ডিস্ট্রিক্টের ১০০ মি ফ্রিস্টাইল প্রতিযোগিতায় থার্ড হয়েছিলাম। তখন আমি 'সংহতি' ক্লাবের সমীর ঘোষের কাছে সাঁতার শিখতাম। এখন সোদপুরে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে শেখর সরকারের কাছে সাঁতার শিখছি। আমি বড় হয়ে বুলাদিদির (বুলা চৌধুরির) মতো ইংলিশ চ্যানেল পার হতে চাই।

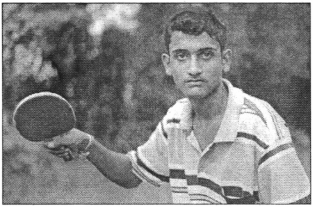
বাফনের খেলা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম

রাজীবকুমার খালখো: আমি গোলকিপার। গোলকিপিং করতে আমার দারুণ লাগে। এগারো জনের দলে গোলকিপারের পজিশনটা আমার কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং। আমি যখন গোলকিপিং করি, তখন মনে হয় মাঠে একটা বাড়তি দায়িত্ব পালন করছি। আমি খুব ছোট থেকেই 'আদিবাসী তীর সঙ্ঘ' ক্লাবে প্র্যাকটিস করতাম। ওই ক্লাবের বিশ্বনাথদা একদিন আমার খেলা দেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে, তোর হবে।' এর বছর দুয়েক বাদে বিশ্বনাথদাই আমাকে সোদপুর ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমি ওই ক্লাবেই প্র্যাকটিস করছি। বর্তমানে



সমীর ব্যানার্জি ও পিয়ারিদা আমাদের কোচিং করান। ম্যাচের আগে আমরা সামান্য জিমন্যাস্টিকও প্র্যাকটিস করি। আমাকে স্পটজাম্পটাও ভালভাবে প্র্যাকটিস করতে হয়, না হলে গোলকিপিং করব কি করে? আমি স্কুলের হয়ে যে কটা টুর্নামেন্ট খেলেছি, তার মধ্যে আমার সেরা পারফরমেন্স ঘোলা নেতাজিনগর স্কুলের এগেনস্টে। বেশ মনে আছে, সেই খেলায় আমি টাইব্রেকারে পাঁচটার মধ্যে চারটে শট বাচিয়েছিলাম। আমাদের স্কুল টিমে আমি আর সুরজিৎ পাল্টাপাল্টি করে গোলে খেলি। আমার ফেবারিট গোলকিপার হল সন্দীপ নন্দী। তবে টিভিতে ইউরো কাপে ইতালির গোলকিপার বাফনের খেলা দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

খেলায় স্পোর্টসম্যান স্পিরিট সবসময় বজায় রাখার চেষ্টা করি



সুবীর দত্ত: টিভির স্পোর্টস চ্যানেল আমার খুব প্রিয়। ফুটবল, ক্রিকেটের পাশাপাশি স্পোর্টস চ্যানেলে আমি টিভিও দেখতাম। খেলাটা দেখতে দেখতে একসময় আমি খেলাটার প্রেমে পড়ে গেলাম। মনে হল এ খেলাটা আমাকে শিখতেই হবে। এর পর একদিন মাকে বললাম, 'মা, আমি টি টি খেলা শিখব, আমাকে কোনও একটা ক্লাবে ভর্তি করে দাও।' মা বলল, পড়াশুনো বজায় রেখে কি খেলাটা চালিয়ে যেতে পারবি? আমি বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ঠিক পারব। দাদা খোঁজখবর করে নর্থ চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাবে আমাকে ভর্তি করে দিল। সেখানে শেষাদ্রি ভট্টাচার্যের কাছে আমি কোচিং নিচ্ছি। ক্লাবের প্রথম দিনটার কথা আমার এখনও মনে আছে। দাদা যখন আমায় ক্লাবে নিয়ে গেল, দেখলাম সেখানে বড় বড় ছেলেরা টেনিস বোর্ডে প্র্যাকটিস করছে। আমি হাঁ করে ওদের প্র্যাকটিস দেখছিলাম, আর মনে মনে ভাবছিলাম আমিও যদি এখানে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাই তবে, একদিন নিশ্চয়ই ওদের মতোই ভাল খেলতে পারব। আমাকে এ পর্যন্ত আমি বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছি। কিন্তু কোনওটাতেই সেমিফাইনালের বেশি যেতে পারিনি। তবে সবসময়েই স্যার আমাকে বলেন, খেলায় হেরে গিয়ে মনোবল ভেঙে পড়লে চলবে না, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা সবসময়েই বজায় রাখতে হবে। আমি সবসময় সেটা মনে রেখেই খেলতে চেষ্টা করি।

ফটো: তমাল ভট্টাচার্য

এতদিনের জুটি ভেঙে গেল

নতুন অধ্যায় নতুন ফুটবল জীবন

মুনাল চট্টোপাধ্যায়, দিল্লি

বিজয়ন-আনচেরি জুটিটাই ভেঙেই গেল। দশটা বছর কম নয়। এতদিন একটানা জুটি বেঁধে বিজয়ন-আনচেরি থাকতে পেরেছেন, ভারতের বিভিন্ন নামী-দামি ক্লাবে খেলেছেন এটাই বিরাট ব্যাপার। কলকাতা ফুটবলে কৃশানু-বিকাশ জুটির কথা সকলেরই জানা। কিন্তু সে জুটিও দশ বছর পূর্ণ করতে পারেনি। এবং সব চেয়ে বড় কথা কৃশানু-বিকাশ দু'জনেই ছিলেন সমসাময়িক ফুটবলার, কিন্তু বিজয়ন-আনচেরি তা নন। আনচেরি যখন সবেমাত্র ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছেন, বিজয়নের ফুটবল খ্যাতি তখন মধ্যগগনে। এমন একটা সময়ে জুটি বাঁধার ঘটনাটা সত্যি আশ্চর্যের। আসলে এর পেছনে একটা ভাল কারণ আছে। সেটা হল আনচেরির প্রতি বিজয়নের ভালবাসা। বিজয়ন কেরল পুলিসে খেলে বেশ নাম করে ফেলেছেন ৮৭-৮৮ সালেই। তবে কেরলের বাইরে তাঁর নামটা তখনও ছড়ায়নি। কিন্তু আনচেরির মতো উঠতি ফুটবলাররা তখন থেকেই বিজয়নের ভক্ত। আনচেরি কলেজে পড়ছেন। একসঙ্গে ত্রিচুর স্টেডিয়ামের মাঠে অনুশীলনও করেন। পরে আনচেরি যোগ দিলেন এস বি টি-তে। বিজয়ন গেলেন কলকাতায়। শুরুর অভিজ্ঞতা ভাল নয়। বিজয়নের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা জেনে আনচেরি কলকাতায় না খেলার পণ করেছিলেন। কিন্তু বিজয়নকে আবার ডাকল মোহনবাগান। এবার বিজয়নকে নিয়ে কলকাতায় বিরাট হৈ চৈ হল। সেটা ১৯৯৩ সাল। তখন থেকেই বিজয়নের সঙ্গে আনচেরির কথা



হচ্ছিল কলকাতায় আসা নিয়ে। কিন্তু বিজয়ন এমনই ছেলে যে কখনও অন্যের হয়ে আব্দার করেননি আগ বাড়িয়ে। আনচেরির ক্ষেত্রেও না। তবে সুপারিশ করতে হয়নি, মোহনবাগান কর্তাদেরই চোখে পড়ে যান আনচেরি ৯৪ সালে কটক সন্তোষ ট্রফিতে। সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ লিগের খেলা শেষে সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলতে হাজির আনচেরি কেরল-কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে। ওড়িশার সঙ্গে ম্যাচ। কেরলের এই স্ট্রাইকার রীতিমতো ওড়িশার রক্ষণকে ছারখার করে দিলেন সেমিফাইনালে। পাঁচ গোলের মধ্যে তিনটিই তাঁর। ফাইনালে বাংলাকে প্রায় ল্যাজেগোবরে করে দিয়েছিলেন আনচেরি। সন্তোষ ট্রফি চলাকালীন তখন কলকাতায় বড় ক্লাবের রিক্রুটার কর্তারা হাজির হয়ে যেতেন। সেবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁরা হামলে পড়লেন ছেলেটিকে পাকড়াও করতে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দু'দলের কর্তারাই হাজির ফুটবলারটির কাছে। আনচেরি তখনও দলবদলের অত ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। তিনি শরণাপন্ন হলেন বিজয়নের। নিজ রাজ্যের ছেলে। খেলায় সিনিয়র হলেও বন্ধু কাম অভিভাবক। বিজয়নই তাঁকে পরামর্শ দিলেন মোহনবাগানে খেলতে। কারণ ওই মরসুমে তিনিও মোহনবাগানে থেকে যান। মোহনবাগান বিজয়নের জন্যই সেবার আনচেরিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে টেক্কা দিয়েছিল। ব্যস শুরু হয়ে গেল বিজয়ন-আনচেরি জুটি পর্ব। ৯৪-এ শুরু। ২০০৩-২০০৪ মরসুমের শেষ পর্যন্ত এই জুটি ছিল অবিচ্ছিন্ন। এর মাঝে বহুবার ক্লাব বদল করেছেন বিজয়ন-আনচেরি, কিন্তু জুটি ভাঙেননি। অথচ দু'জনে এক সঙ্গে খেলা শুরু করেননি। দু'জনের ফর্মও সব সময় এক রকম ছিল না। এমনকি এমন পরিস্থিতিও এসেছে যখন হয় বিজয়ন, নয় আনচেরি চোট-আঘাতে জর্জরিত, তখনও জুটি ভাঙেনি। এর রহস্যটা কী? প্রশ্নটা করেছিলাম আনচেরির কাছে। এটা কি পরিকল্পিত? মানে, এমন কোনও শর্ত থাকত ক্লাবের কাছে যে একজনকে নিলে অন্যজনকে নিতে হবেই? আর্থিক চুক্তিও কি সেভাবে হত? এই কারণেই কি দেখা যেত দু'জনের মধ্যে একজনের ফর্ম খারাপ থাকলে বা চোট থাকলে অন্যজন ক্লাবকে অনুরোধ করতেন বা বাধ্য করতেন নিতে? আনচেরি অবশ্য জুটি অবিচ্ছিন্ন রাখার এমন প্রয়াসের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, মোহনবাগানে দু'জনে এক সঙ্গে খেলে সফল হওয়ার পর থেকে সকলেরই একটা বদ্ধ ধারণা হয়েছিল তাঁদের দু'জনকে এক সঙ্গে পেলে দলের ভাল হবে। হয়ত ক্লাবকর্তারা মনে করেছিলেন খেলার মাঠে আমাদের দু'জনের বোঝাপড়া এত ভাল যে সেটা দলের কাজে লাগবে। তা ছাড়া বিজয়ন একজন জিনিয়াস। পা, মাথা, সারা শরীর দিয়ে ফুটবল খেলতে পারে, সেখানে অনেকের কাছে আমার প্রয়োজনীয়তা ছিল বাঁ পায়ের ফুটবলার বলে। ৯৪ সালে ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোলটা তাঁকে প্রথম প্রচারের আলোয় এনে দেয়। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৯৪-এ শুরুটা যতটা ঝলমলে, শেষটা নয় আনচেরির কাছে। ওই বছর বাঙ্গালোরে সিজার্স কাপে দশ জনে খেলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিলেন তাঁরা। ইস্টবেঙ্গল তখন হারতে হারতে কোণঠাসা। কিন্তু রোভার্সে অকস্মাৎ ছন্দপতনে মোহনবাগান সাফল্যের রাস্তা থেকে সরে এল। মোহনবাগান কর্তাদের পুরনো রোগটা ফিরে এসেছিল। ফুটবলারদের ওপর আস্থা রাখতে না পারা। মরসুম যত শেষ দিকে গড়াচ্ছিল সেই অবিশ্বাসটা বাড়ছিল। তখনই দিল্লিতে যোগাযোগ জে সি টি কোচ সুখবিন্দার সিংয়ের সঙ্গে। জে সি টি-র কর্ণধার সমীর থাপারকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন কথা বলতে। জাতীয় লিগের কথা মাথায় রেখে জে সি টি নতুন করে ঢেলে বড় মাপের দল সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল। ৯৫-৯৬ মরসুমের জন্য বিজয়ন-আনচেরির সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায় জে সি টি-র।





এতদিনের জুটি ভেঙে গেল। তবে বিজয়নের পক্ষে খুব ভাল হয়েছে। গোয়া থেকে ওর বাড়ি যাতায়াত করা সুবিধা হবে। আমি চেষ্টা করছি বিজয়নকে ছাড়াই দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, যা এতদিন করতে হয়নি। এটাও আমার কাছে এক নতুন অধ্যায়, নতুন ফুটবল জীবন



আনচেরির বক্তব্য, এরপর আর জুটি ভাঙার প্রয়োজন হয়নি। কারণ দু'বছর জে সি টি-তে ছিলাম। ওই দুই মরসুমে আমার জীবনের সেরা ফুটবল খেলেছি। এরপরই কোচি এফ সি ক্লাবের আত্মপ্রকাশ ঘটল। তখনও ওই ক্লাবের কর্তারা ভাল আর্থিক প্রস্তাব নিয়ে হাজির আমাদের দু'জনের কাছে। অনেকে হয়ত ভাবেন, আমরা বুঝি এক সঙ্গে কথা বলতাম ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে। আর্থিক চুক্তি নিয়ে দর-দস্তুর করতাম। মোটেই না। বরাবর কথা হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। আর্থিক চুক্তির অঙ্কও কখনও এক রকম হত না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও দিন ভুল বোঝাবুঝিও হয়নি। তবে এটা বলতে দ্বিধা নেই আমরা চেষ্টা করেছি বরাবরই একটা দলে খেলতে। তার পিছনে আর্থিক কোনও কারণ ছিল না। কারণটা নিতান্তই পারিবারিক। প্রথমত, আমাদের দু'জনের বাড়ি এক জায়গায়। তাই খুব অল্প বয়স থেকেই একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিজয়ন সিনিয়র বলে ভারতের বিভিন্ন ক্লাবে সে



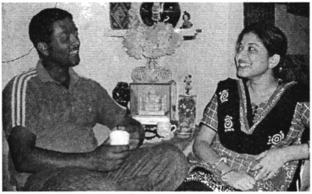
আগে খেলা শুরু করেছিল। ক্লাব রাজনীতিটা ওর ভাল জানা ছিল। তাই সব সময় ওকে অভিভাবক হিসেবে মানতাম। ওর পরামর্শ নিতাম। আর সব চেয়ে বড় কথা শুরুতে আমাদের দু'জনেরই ভাষা সমস্যা ছিল। এক সঙ্গে থাকায় আমাদের কথা বলার জন্য অভাব হয়নি। এই কারণে কোচি এফ সি-র হয়ে খেলাও শুরু করি এক সঙ্গে। কিন্তু যখন দেখলাম ওই ক্লাবের কর্তাদের নিজেদেরই চরিত্রের ঠিক নেই তখন দু'জনে মোহনবাগানে যাই। কেন জানি না কলকাতার বাইরের ক্লাবে খেলে যতটা সফল, ততটা কলকাতায় নয় কেন? হয়ত বেশি খেলা, চাপ, চোট। কারণ ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়েও সেরাটা দেওয়া হয়নি। এই আক্ষেপটা আমার ও বিজয়নের দু'জনেরই আছে। তবে সেটা মেটানোর আর সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে করি না। কারণ বিজয়ন আর বেশিদিন খেলবে না। গত দু'বছর থেকেই বিজয়ন আমাকে বলছিল, ও খেলা ছেড়ে দেওয়ার সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ওর কথা না ভেবে আমি যেন শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। জুটিটাকে বড় করে না দেখি। যে ক্লাব ভাল প্রস্তাব দেবে যেন চলে যাই। আমি কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম। কিন্তু এবারই জে সি টি-তে থাকাকালীন বিজয়ন আমাকে বলেছিল কেরলের বাইরে বেশিদিন থাকা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ ওর পরিবারের দায়িত্ব বেড়েছে। তা ছাড়া ওর নিজস্ব একটা ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরির কারখানা হয়েছে। তার দেখাশোনা করতে সপ্তাহে দু'তিনবারের বেশি ত্রিবান্দ্রম যেতে হয়। তারপর আকাদেমির দায়িত্বও আছে। চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও নাম হয়েছে। আরও অভিনয়ের প্রস্তাব পাচ্ছে। তাই বেশি দায়িত্ব নিয়ে কোনও ক্লাবে ওর পক্ষে সম্ভব নয় সারা বছর। এই কারণেই কলকাতা থেকে প্রস্তাব পেয়েও ও রাজি হয়নি। আমাকে বলেছিল সুযোগ পেলে ছেড়ো না। তাই আমিই চলে গেলাম মোহনবাগানে। জুটি ভেঙে গেল। তখনও ও জে সি টি-তে থাকবে বলে মনস্থির করেছিল। কিন্তু ওর মনটা ঠিক ছিল না। বুঝেছিল আমি না থাকলে ওর ভীষণ একা একা লাগবে। দিল্লিতে সত্যেন ভাইয়ের সঙ্গে থাকার সময় সেকথা বলেও ছিল। ওখানেই গোয়া থেকে চার্চিল আলেমাও এসেছিল রথ দেখা আর কলা বেচা সারতে। নতুন ফুটবলার খুঁজতে এসে আলেমাও চার্চিলে খেলার প্রস্তাব দেয় বিজয়নকে। ও রাজি হয়ে যায়। মনটা খারাপ হয়েছেই। এতদিনের জুটি ভেঙে গেল। তবে বিজয়নের পক্ষে খুব ভাল হয়েছে। গোয়া থেকে ওর বাড়ি যাতায়াত করা সুবিধা হবে। আমি চেষ্টা করছি বিজয়নকে ছাড়াই দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, যা এতদিন করতে হয়নি। এটাও আমার কাছে এক নতুন অধ্যায়, নতুন ফুটবল জীবন। জানি না এর মেয়াদ কত?

ত্রিপুরার ডায়েরি

আগরতলা থেকে **সরোজ চক্রবর্তী**

টি সি এ সচিব ও যুগ্মসচিব নিয়ে নাটক

রনজি দল নিয়ে বিতর্ক



সস্ত্রীক তিমির চন্দ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে কলকাতার বুকে বিস্তর যে নাটক ঘটে গেছে, সেই নাটকের একটা দৃশ্যে অদৃশ্যভাবে জড়িয়ে গেছে ত্রিপুরাও। বোর্ডপ্রধান জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়াত সচিব সমীরণ চক্রবর্তীর সম্পর্ক দীর্ঘ বছরের। মূলত তিনি ডালমিয়ার গোষ্ঠীর একজন 'মাথা'। কিন্তু বোর্ডের এবারের নির্বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক মাথারা জড়িয়ে যান। এবং রাজনৈতিক দলগুলোও। বি জে পিপন্থী ডালমিয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রাক্তন জাঁদরেল নেতা ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার সম্মুখ সমরে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ করে তাঁর দিকে ঝুঁকে যায় সি পি এমের পলিটব্যুরোর রথী-মহারথীরা। ডালমিয়ার ঘাঁটি ভাঙতে শারদকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বসে সি পি এম। ত্রিপুরার সমীরণ চক্রবর্তীও সি পি এমের মতদপুষ্ট ছিলেন। কিন্তু কখনই ভাবতে পারেননি বোর্ডের নির্বাচনে তাঁর রাজ্যের শাসকদল জড়িয়ে গিয়ে নতুন ভূমিকা নিয়ে ফেলবে। দিল্লি পলিটব্যুরো থেকে যখন ত্রিপুরার সি পি এম মহলে বার্তা এল, ভোটটা এবার শারদকে দিতে হবে, তখন চেন্নাইয়ে অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় সমীরণ চক্রবর্তী সম্মতি দিলেন যে, তিনি কলকাতায় গিয়ে 'পার্টি'র কথামতো ভোট দেবেন। আসলে ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর রাজ্যের ক্রিকেট সচিব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করবেন। 'প্রতিশ্রুতি' দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি পেয়ে ত্রিপুরার সি পি এম পড়ে গেল বেকায়দায়। সমীরণ চক্রবর্তীর প্রতিনিধি যুগ্মসচিব মানিক কাজি তখন ডালমিয়ার ফাঁদে ও আস্তানায় আত্মসমর্পণ করে ভোটের দিন 'বিক্রি' হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ডালমিয়া জিতলেন। এবং নিজের শহরে ফিরে এসে বিপর্যস্ত সমীরণ চক্রবর্তী মারা গেছেন। বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল ত্রিপুরার ক্রিকেট সাম্রাজ্যে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনিই বুকে করে আগলে রেখেছিলেন ত্রিপুরার ক্রিকেটকে। ক্রিকেটের তেমন কোনও উন্নতি হয়নি ঠিকই। কিন্তু যতদিন গেছে ডালমিয়ার শিবিরে প্রভাব বেড়েছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'সমীরণদা'-র। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস। তিনি নাকি নিজের অ্যাসোসিয়েশনে এমন এমন কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাকে মাথায় তুলেছেন, বিনা টেন্ডারে যাঁদের 'শ্রদ্ধেয় সমীরণদা' লাখ লাখ টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। এবং বোর্ডের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া গেছে, কত খরচ হয়েছে, তার হিসেব কাগজকলমে পরিষ্কার থাকলেও আদৌ স্বচ্ছ নয়। এর ফলে পরোক্ষভাবে প্রয়াত সচিবের ভাবমূর্তি ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। বরং 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বেরিয়ে পড়বে, এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না নতুন কর্মকর্তারা। কিন্তু কেউ এখন এ নিয়ে কিছু বলেননি, শুধু 'বুঝছেন'। থুতু ওপরের দিকে ছুঁড়লে নিজেদের গায়েও পড়তে পারে, এই ভেবে নতুন সচিব ও যুগ্মসচিবের বাহিনী বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি করছেন না। সচিব পদ নিয়েও প্রয়াত সচিব তাঁর মৃত্যুর আগে ক্রীড়াপর্ষদ সচিব কমল সাহার নামেও এমন মিথ্যে প্রচার ছড়িয়ে গেছেন, যার ফলে কিছু নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। কমল সাহা এতটাই সৎ ও অভিজ্ঞ যে, টি সি এ-র সচিব হলে হিসেবের গরমিল ও নয়ছয় ধরে ফেলবেন, এই আশঙ্কায় সমীরণ চক্রবর্তীর অনুগামীরা সেই অপপ্রচারকে আরও কাজে লাগালেন। কিন্তু খোদ কমল সাহার ইচ্ছায় নতুন সচিব মনোনয়ন মসৃণ হল। যদি তিনি 'আজীবন সদস্য' হওয়ার ক্ষেত্রে অতীতে যেভাবে নির্বাচন করিয়ে জয়ী হয়েছিলেন, সেরকম জেদ ধরলে সচিব পদের জটিলতা বাড়ত। কিন্তু অরিন্দম গাঙ্গুলি যেহেতু যুগ্মসচিব হিসেবে এক দশকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রমাণ করে রেখেছেন, সেই কারণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সচিব হন। কিন্তু যুগ্মসচিব পদে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন এড়ানো গেল না। এখানেও ঢুকে পড়ল সি পি এম 'ক্রীড়া-নেতৃত্ব'। যেহেতু এক সময় পোলস্টার ক্লাবের ডাকাবুকো সচিব তপন গুহ দলবল নিয়ে সি পি এম ছেড়ে পি ডি এসে যোগ দেন, সেই কারণে তাঁকে সমর্থন না জানিয়ে 'পার্টি'র আর এক দক্ষ কর্মী জে সি সি-র মলয় চক্রবর্তীকে জিতিয়ে আনল ক্রীড়া-নেতৃত্ব। অথচ সি পি এমের একটি মহলের সঙ্গে একাধিক দিন আলোচনা করে যুগ্মসচিব পদের দাবিদার হয়েছেন তপন। কিন্তু মহকুমার প্রতিনিধিরা যেহেতু পার্টির কর্মী, সেই কারণে নির্বিবাদী মলয়কে ভোট দিয়ে জেতান। এবং এই অপ্রত্যাশিত নির্বাচন (গত ৩২ বছরে এই প্রথম লড়াই হল!) এসে গেল, নির্বাচকরাও তার শিকার হয়ে ভোটের স্বার্থে রনজি দলে বহির্রাজ্যের ক্রিকেটার ঢুকিয়ে খুশি করলেন ক্লাবগুলোকেও। স্থানীয় ক্রিকেটারদের উপেক্ষা ও বঞ্চিত করে মাননীয় নির্বাচকরা ২৪ জনের দীর্ঘ ও হাস্যকর তালিকা তুলে দেন টি সি এ-র হাতে। নির্বাচনের দিন সকালে তড়িঘড়ি রনজি দল গড়ে শাসক গোষ্ঠীর ভোট পাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করে দেন। মহকুমার ১৪ ভোটের মধ্যে ১২ ভোট মলয় পান। এ ছাড়া ক্লাবের ১৪ ভোটের মধ্যে অন্তত ৯/১০টা। আজীবন সদস্যদের একাধিক ভোটে মোট ২৪-১০ ব্যবধানে মলয় হারিয়ে দেন তপনকে। এবং একইসঙ্গে নির্বাচকরাও তাঁদের রাজ্যের ক্রিকেটারদের খেটেখাওয়া, অল্প সুযোগে বেড়ে ওঠা ও রনজি খেলে বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন এবং পাশাপাশি টাকা পাওয়ার সুযোগটাকেও হারিয়ে দিলেন! অদ্ভুত এক রাজ্য। যেখানে প্রথম ৯ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন ঘরের ছেলে। বাকি ৯ জনের মধ্যে ৩ জন স্থানীয়। অর্থাৎ ২৪ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জন স্থানীয় : তিমির চন্দ, তুষার সাহা, জয়ন্ত দেবনাথ ও সুজিত রায় এবং রাজীব দত্ত, রাজদেব দত্ত ও সন্দীপ ব্যানার্জি। তিমিরের হাতে নেতৃত্ব না-তুলে দিতে পারলেও খুশি হতেন নির্বাচকরা। ১৬-১৯ নভেম্বর হরিয়ানা ম্যাচ দিয়ে ত্রিপুরার রনজি অভিযান শুরু।



যুগ্ম সচিব মলয় চক্রবর্তী

অরিন্দম গাঙ্গুলি (নতুন সচিব)

সবুজ দিগন্তের বলাকা

নতুন করে স্বপ্ন দেখে শুক্লা কাদামাটি দিয়ে খেলোয়াড় গড়ার

শুক্লা নাগ





তাইওয়ান সফরে শুক্লা নাগ ও শুক্লা দত্ত।

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

বাংলা মহিলা ফুটবলের গোলকিপার বলতে একটা সময় পর্যন্ত একইসঙ্গে উচ্চারিত হত দুটো নাম— রমা দাস আর শুক্লা নাগ। প্রায় পনেরো বছর একটানা ফুটবল খেলছে শুক্লা। নানা ওঠাপড়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শুক্লা আজ এসে দাঁড়িয়েছে তার ফুটবল জীবনের সীমান্তে। যার একদিকে সবুজ মাঠের সোনালি দিন, আর একদিকে ধূসর গোধূলি। স্মৃতির অলিন্দে দাঁড়িয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখে শুক্লা কাদামাটি দিয়ে খেলোয়াড় গড়ার— অনেক অনেক শুক্লা, রমাদের গড়ে দিতে চায় সে।

শুক্লার ফুটবলে আসাও এক মজার ঘটনা। প্রথম দিকে শুক্লা পায়োনিয়র ক্লাবে হ্যান্ডবল খেলত। ওদের পাড়াতেই থাকতেন নিলি ঘোষ। নিলি তখন মহিলা ফুটবলের বিশিষ্ট তারকা এবং ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপটেন। প্রায়ই ওর কাগজে ছবি বেরোত। কাগজে নিলির ছবি দেখে শুক্লা মনে মনে ভাবত— ইস্! আমিও যদি নিলিদির মতো ফুটবল খেলতে পারতাম। শুক্লার এই ইচ্ছেটাই একদিন সত্যি হয়ে গেল। নিলিই একদিন শুক্লাকে নিয়ে গিয়ে তৎকালীন কোচ সুশীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'সুশীলদা এই হল শুক্লা। ও আমাদের পাড়াতেই থাকে। হ্যান্ডবলে গোলকিপার পজিশনে খেলে। ওর খুব ইচ্ছা ফুটবল খেলার। তুমি ওকে একটু দেখবে?' সুশীল ভট্টাচার্য শুক্লাকে একটু পরীক্ষা করে নিলেন। বলা বাহুল্য সে পরীক্ষায় উতরে গিয়েছিল শুক্লা। মাঠে আসার ছাড়পত্র পেয়ে পরদিন থেকে শান্তি, কুন্তলাদের সঙ্গে জোরদার প্র্যাকটিস শুরু করে দিল ও। শান্তি, কুন্তলারাও পায়োনিয়র ক্লাবে হ্যান্ডবল খেলত। তাই ওদের সঙ্গে আর নতুন করে পরিচয় করতে হল না শুক্লাকে।

ফুটবল জীবনের শুরুটা ভালই হল শুক্লার। প্রথম ন্যাশনাল খেলেছিল কালিকটে। গোয়ার বিরুদ্ধে সে খেলার কথা আজও ভুলতে পারেনি শুক্লা। তবে স্মরণীয় খেলা বলতে শুক্লার চোখে আজও ভাসে ভদ্রেশ্বরে ফেডারেশন কাপের ছবিটা। সেবার কেরলের সঙ্গে ফাইনাল। ফাইনালের আগের দিন রাতেও শুক্লা জানে না পরদিন গোলে কে খেলবে, সে না রমা? অবশেষে পরদিন সকালে কোচ অজয় লাহিড়ী যখন এগারো জনের নাম ঘোষণা করলেন, তখন শুক্লা দেখল, গোলকিপার হিসেবে তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। আগের ম্যাচে দল হেরেছে। এ ম্যাচে জিততেই হবে। বিপক্ষের কঠিন শট যে করেই হোক আটকে দিতে হবে— এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নামল শুক্লা। কেরলের সেরা স্ট্রাইকার সোনুর একেবারে ওয়ান ইজ টু ওয়ান পজিশন থেকে নেওয়া শট আটকে দিয়েছিল শুক্লা। শুধু সোনু নয় টপবক্সের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সজিতার নেওয়া ফ্রি-কিক ফিস্ট করে বাঁচিয়েছিল শুক্লা। শুধু ন্যাশনাল, ফেডারেশন কাপ, ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ নয়, বিদেশেও খেলতে গিয়েছিল শুক্লা। একবার তাইওয়ানে খেলতে গিয়ে স্থানীয় লোকেদের খাদ্যাভ্যাস দেখে প্রায় ভিরমি খাবার জোগাড় হয়েছিল ওর। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখে লোকে হাঁড়ির মধ্যে করে জ্যান্ত ব্যাঙ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই দেখে আরও রাস্তামুখো হয়নি শুক্লা। আরতিদি (আরতি ব্যানার্জি, মহিলা ফুটবলের সেক্রেটারি) হোটেলে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন, তাই ভারতীয় ফুটবলারদের প্রণফ্রায়েড রাইস আর স্যুপ দেওয়া হত। গাড়িভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনও পকেটমানি দেওয়া হত না ওদের। শুক্লা নিজে সামান্য যা টাকাপয়সা নিয়ে গিয়েছিল তাই দিয়েই জুতো আর জ্যাকেট কিনেছিল।

শুধু সেবার নয়, আরও একবার এশিয়ান কাপ খেলার জন্য ইন্ডিয়া ক্যাম্পে ডাক পেয়েছিল শুক্লা। ক্যাম্পে ওর পারফরমেন্সও বেশ ভাল ছিল। কিন্তু কোচ মি থাপার শুক্লা ও আর কয়েকজন বাংলার খেলোয়াড়কে ভাল পারফরমেন্স থাকা সত্ত্বেও বাদ দিয়েছিলেন।

ভারতীয় ফুটবলে এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণ ও ভুল নির্বাচনের দায়ভার বহন করে ভারতীয় ফুটবল চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। নষ্ট হয়ে গেছে অনেক উদীয়মান ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ। এসব সত্ত্বেও ফুটবলকে বুকে আঁকড়ে বাঁচতে চায় শুক্লা। চোখে তার অনেক স্বপ্ন। বাবা মারা যাওয়ার পরেও শুক্লা পুরোদমে ন্যাশনাল খেলেছে। কিন্তু বছর দুয়েক আগে মা যখন মারা যায়, তখন শুক্লা অনেকটাই ভেঙে পড়ে। দিশেহারা শুক্লা বুঝতে পারে না কী করবে। ফুটবল শুক্লাকে তার প্রাপ্য সম্মান বা চাকরি কোনওটাই দেয়নি। তার ওপর মা-ও চলে গেল। মানসিক কষ্ট, অস্থিরতা কাটাতে মাঠেই ফিরে এল শুক্লা। সময় পেলেই চলে যেত মোহনবাগান গ্রাউন্ডে। তখন মোহনবাগান মহিলা ফুটবল টিমের কোচিং করাতেন কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার। কিন্তু বিভিন্ন কাজে কুন্তলাকে দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে থাকতে হত। সেইসময় একদিন রত্না নন্দী (কর্মকর্তা) শুক্লাকে মোহনবাগান টিমের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিতে বলেন। কুন্তলারও সায় ছিল এই প্রস্তাবে। শুক্লাও আনন্দে সেই প্রস্তাব মেনে নিল। এরপর ২০০২ এবং ২০০৩ পরপর দু'বছর মোহনবাগান টিমকে কোচিং করাল শুক্লা। তবে গতবছর পেমেন্ট পেলেও এ বছর কোনও টাকাই পায়নি শুক্লা।



- ফিফার বিশিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে

এত কিছুর পরেও খেলার প্রতি ভালবাসা এতটুকু কমেনি শুক্লার। আজও মনে পড়ে তার খেলোয়াড় জীবনের রঙিন দিনগুলোর কথা। হাসি-মজা-উৎকণ্ঠা-বন্ধুত্বে ভরা দিনগুলো। শুক্লার মনে আছে একবার ট্রেনে চেপে কলকাতার বাইরে খেলতে যাচ্ছে। ওদের কূপে এক ভদ্রলোকও উঠছেন। তাঁর সঙ্গে আছে একঝুড়ি সতেজ আপেল আর আঙুর। একবার দেখলেই লোভ লাগে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েরা বেশ ভাব জমিয়ে নিল। রাতের জার্নি। প্রথম রাতেই খাওয়াদাওয়া সেরে ভদ্রলোক লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই শুরু হল তার নাসিকা গর্জন। এই মওকায় মেয়েরা শুরু করে দিল নৈশ অভিযান। যাকে বলে অপারেশন বাসকেট। দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের ঝুড়ি একেবারে ফাঁকা। অপারেশন শেষে মেয়েরা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। এছাড়া আর উপায় কী? কারণ আর দু-তিনটে স্টেশন বাদেই যে ভদ্রলোক নামবেন। স্টেশনে নামবার সময় খালি ঝুড়ি দেখে ভদ্রলোকের মুখের করুণ অবস্থার কথা আজও ভুলতে পারে না শুক্লা। ভদ্রলোক বুঝেছিলেন এ কীর্তি কাদের। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেননি কিছুই। তবে মেয়েরা যে দুষ্টুমিতে ছেলেদের বাড়া হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা বোধহয় ওই ভদ্রলোকের জীবনে এই প্রথম।

শুক্লা বলল, 'আর একবার মণিপুরের সঙ্গে খেলা ছিল। আমরা মাঠে নামার আগে দরজা বন্ধ করে সবাই মিলে প্রার্থনা করছিলাম। অন্য দলগুলো জানত এই সময় আমাদের বিরক্ত করলে আমরা ভীষণ রেগে যাই। প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটানো মানেই আমাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। সেবার তাই ইচ্ছা করেই মণিপুরের ' মেয়েরা প্রার্থনার সময় দরজায় টোকা মারল। শুধু তাই নয়, বাংলা দলের হোটেল থেকে মাঠে যাওয়ার পথে ফাঁকা কলসী, কলা এসবও রেখে দিয়েছিল। এসব অলক্ষুণে কাণ্ড দেখে আমাদের সবার মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে গেল। দলের মধ্যে পিঙ্কিদি (ইতিকণা) বলল, 'দাঁড়া খেলে ফিরি, যদি অঘটন কিছু ঘটে, তবে ওদের ঘরে জল ঢেলে সব কিছু ভিজিয়ে দেব।' পিঙ্কিদি আমাদের সবার হয়ে এভাবেই প্রতিশোধ নিত। কিন্তু সেবার ২-০ গোলে মণিপুরকে হারিয়েছিলাম। সেই আনন্দে পিঙ্কিদির জলঢালা থেকে ছাড় পেয়ে গিয়েছিল ওরা।

শুধু খেলতে গিয়ে নয়, খেলার মাঠেও একবার একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটিয়েছিল শুক্লা। এক অভিনব কৃতিত্বে বাঁচিয়েছিল পেনাল্টি শট। বাংলা দলকে দুটো ভাগ করে খেলা চলছে। একটা দলের গোলকিপার শুক্লা আর অন্য দলে রয়েছে বাংলার ডাকসাইটে ফরোয়ার্ড শান্তি মল্লিক। খেলার মাঝামাঝি সময়ে শান্তিরা একটা পেনাল্টি পেয়ে গেল। শান্তি এগিয়ে এসেছে পেনাল্টি মারার জন্য। হঠাৎ শুক্লার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। শান্তি শট মারার আগে শুক্লার দিকে তাকাতেই শুক্লা চোখটা ট্যারা করে আবার সোজা করে নিল। শট মারতে গিয়ে শুক্লার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেয়ে গেল শান্তির। আর হাসতে গিয়েই বিপত্তি। শট সোজা উড়ে গেল গোল পোস্টের বাইরে। এক কথায় যাকে বলে 'এ জেম অফ সেভ'। ঘটনাটা মনে পড়লে আজও হেসে ফেলে শুক্লা।

ফুটবল কোচিংয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও একটা NIS কোর্স করে নিতে চায় শুক্লা। খুব কম কথা বলা শান্তশিষ্ট এই মেয়েটি রান্না করতে ভালবাসে আর অবসর পেলে গান শোনে। ইলিশ মাছ ওর খুব প্রিয়। অলিভার কান, তাফারেল আর সুরজিৎ সেনগুপ্তের খেলার ভক্ত শুক্লা। শাড়ি নয়, প্যান্টশার্টই ওর প্রিয় পোশাক। ওই পোশাকেই ও যোগ দেয় বাড়ির মনসা পুজোয় কিংবা পাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনে। এভাবেই দিন কাটে শুক্লার। মনে আশা, কোনওদিন স্পনসর পেলে ওর গোলকিপার তৈরির স্বপ্নটা সত্যি হবে। ফুটবল ওকে প্রায় কিছুই দেয়নি। কিন্তু শুক্লা আজও নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় আগামীর ফুটবলেই। এখানেই ওর ফুটবল ভালবাসা সার্থক হয়ে ওঠে।



উপেক্ষিত কালনার কবাডি গ্রাম

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক-আধজন নয়, কালনার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম কালীনগরের পঞ্চাশ জনেরও বেশি ছেলে কোনও না কোনও সময়ে রাজ্য বা জাতীয় কবাডি দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই এলাকার মানুষরা 'কাবাডি গ্রাম' বলতে একডাকে কালীনগরকে চেনেন। কিন্তু সভ্যতার সামান্য আলোটুকুও এই কাবাডি গ্রামে না পৌঁছোনোয় এলাকার মানুষজন অত্যন্ত হতাশ। এমনিতে ভাগীরথীর অন্য পাড়ে অবস্থানের জন্য গ্রামটি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। কালনার মালতিপুর থেকে গঙ্গার পিয়ারিনগর ঘাট থেকে নৌকো ছাড়া এই গ্রামে পৌঁছোনোর কোনও পথ নেই। ভাল রাস্তা, বিদ্যুৎ, উচ্চবিদ্যালয়, ডাকঘর, টেলিফোন শুধুই নয়, নেই-এর তালিকায় আরও অনেক কিছু। সব দিক থেকে অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও কবাডির কোর্টে আলোর তারকার জন্ম দিতে কোনও ক্লান্তি ঘটেনি কালীনগরের। গ্রামের প্রথম কবাডি তারকা ইনসান আলি (যিনি এলাকায় খ্যাত 'দ্রোণাচার্য' নামে) গ্রামে কবাডি তারকা তৈরির বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে সমুদ্রগড় রেলবাজার মাঠে স্থানীয় বান্ধব সমিতির সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলেন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ন-পাড়ার অনিসা খাতুন, শ্রীরামপুরের নূপুর দেবনাথ, বগপুরের সমাপ্তি মণ্ডল, হাট সিমলার শেখ রমজানসহ অনেকেই সেখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে রেলের চাকুরে ইনসান পাঁচবার রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াও উনআশি সালে কলকাতায় আয়োজিত ইন্দো-বাংলাদেশ কবাডি প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া দশ বছর পূর্ব রেলের কবাডি দলের প্রশিক্ষক ছিলেন। ইনসান বলেন, 'ফুটবল-ক্রিকেটে কেউ একটু নাম করলেই সব মহলই তার পিছনে ছোটে। খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রাম বা শহর আলোর সামনে চলে আসে। অথচ কালীনগর এত তারকা জন্ম দিয়েও কালো হয়ে আছে। গ্রামের ছেলে-পিলেরা সামান্য সুযোগটুকুও পায় না।' ইনসানের কথার খেই ধরে নব্বই সালে বেজিং এশিয়াডে সোনাজয়ী কবাডি দলের সহ-অধিনায়ক এই গ্রামের আনজার আলির আক্ষেপ: 'সরকার যদি সামান্য সুযোগ-সুবিধাটুকুও দেয় তাহলে গ্রামের ছেলেরা একটু উৎসাহিত হতে পারে। কবাডির বহু প্রতিভা হাজার তিনেক বাসিন্দার এই গ্রামে এখনও লুকিয়ে আছে।'

উত্তরবঙ্গের খেলার খবর

পার্থপ্রতিম সরকার

শিলিগুড়ি বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব আয়োজিত ক্রশ কান্ট্রি রেসে সফল পাহাড়ি দৌড়বিদ। মহালয়ার সকালে এবারও হল ১৫ কিলোমিটার দূরত্বের এই রেস। ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে যার সূচনা। ফ্ল্যাগ অফ করে রেসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পাঁচবারের এভারেস্ট জয়ী পর্বতোরোহী কুশান শেরপা। শিলিগুড়ি শহর ছাড়িয়ে মাটিগাড়া ছুঁয়ে বাঘাযতীন ক্লাবের সামনে শেষ হয় ১৫ কিলোমিটার ক্রশ কান্ট্রি রেস। অংশ নেন ১২৫ জন অ্যাথলিট। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন অ্যাথলিটরা। সেবার ট্রফি পেলেন গ্যাংটকের আর বি সুব্বা। সময় ৫১ মিনিট ৩২ সেকেন্ড। নদীয়ার বাবলু ঘোষ দ্বিতীয় (৫২ মিনিট ৯ সেকেন্ড)। তৃতীয় হন নদীয়ার সুকান্ত সাঁতরা। সময় ৫৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড। আয়োজকরা ক্লাবের চার কৃতী অ্যাথলিট— উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সুগ্রীব রায়, বেবী ঘোষ এবং শিল্পী ঘোষকে সংবর্ধনা জানায়।

□ **ফিফা-ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগ:** ক্রীড়াঙ্গনে এবার হাজির ইউনিসেফ। গ্রামের কচি-কাঁচাদের আরও বেশি মাত্রায় ফুটবলমুখী করে তুলতে ফিফার সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগী ইউনিসেফ। বাংলার ফুটবলের কথা মাথায় রেখে দেশে একমাত্র এই রাজ্যেই শুরু হল তাদের নব উদ্যোগ। বাংলার মুর্শিদাবাদ এবং জলপাইগুড়ি— দুই জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ারে আয়োজন করা হয় প্রাথমিক স্কুলের ফুটবল ম্যাচের। গ্রামের মেয়েরা যাতে ফুটবলে নিজেদের জড়িয়ে নেয় — সেই উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ার সূর্যনগর মাঠে স্কুল ছাত্রীদের প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে জেলার ৩২টি প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ফুটবল সামগ্রী তুলে দেন রাজ্যের বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন। বারপোস্ট থেকে জার্সি, ফার্স্ট এইড থেকে ফুটবল — সবই মিলেছে কিটসে। স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের।

□ **টাউন ক্লাবের ইনডোর ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন:** ১০৬ বছরের ঐতিহ্যশালী জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের নিজস্ব ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল। রাজ্যের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য উদ্বোধন করেন। ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্টেডিয়ামে টেবিল-টেনিস, ব্যাডমিন্টন চলবে। সঙ্গে থাকছে অত্যাধুনিক মাল্টিজিম। এস পি রায় মেমোরিয়াল এই ইনডোরে বর্ষাকালে ক্রিকেটের নেট প্র্যাকটিসও চলবে বলে ক্লাবকর্তারা জানিয়েছেন।

□ **বালুরঘাটে ফুটবল:** বালুরঘাট টাউন ক্লাব আয়োজিত লাজিকা কাপ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ডাকরা স্পোর্টিং ক্লাব। উপভোগ্য ফাইনালে ডাকরা স্পোর্টিং টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারায় রায়গঞ্জ পরিবহণ দলকে। নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাচ ছিল ১-১। টাইব্রেকারে অনবদ্য হয়ে ওঠা ডাকরা স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক নয়ন চৌধুরি পেলেন ফাইনালের সেরা ফুটবলারের ট্রফি।

□ **তিস্তা-করলা কাপ ফুটবল:** গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে তিস্তা-করলা কাপ এবার জিতে নিল যুবশক্তি অ্যাসোসিয়েশন। নেতাজি মর্ডান ক্লাব আয়োজিত এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে নৈশালোকে বেলাকোবা যুবশক্তি ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় শিলিগুড়ি পরিবহণ দলকে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দূরপাল্লার জোরালো শটে জয়সূচক গোলটি করেন ফাইনালের সেরা ফুটবলার দীপেশ রায়।

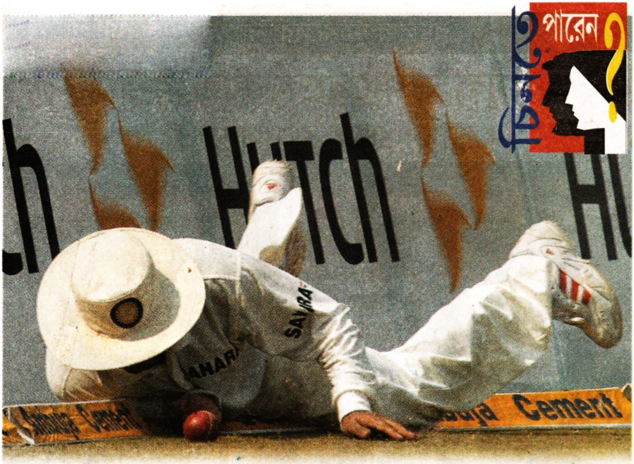
তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে চায় এফ এস ডি এ



অনীশ ঘোষ

এফ এস বি-র মঞ্চে প্রাক্তন তিন ফুটবল তারকা— সনৎ শেঠ, সমরেশ চৌধুরি, গৌতম সরকার। সঙ্গে রয়েছে বিবেকবার্তার সভাপতি রতনময় ঘোষ ও সচিব শ্যামলী ঘোষ।
ছবি: অনীশ ঘোষ

বাংলার ফুটবলে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করতে তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করার লক্ষ্যে জন্ম হল নতুন এক সংগঠনের। বারাসত পুরসভার বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহে এক ঝলমলে আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে সেদিন হাজির হয়েছিলেন ফুটবল ও সিনেমা জগতের একগুচ্ছ তারকা। নবগঠিত 'ফুটবল অ্যান্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' বা এফ এস ডি এ অচিরেই কাজ শুরু করবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। এই সংস্থায় সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন ক্রীড়া জগতের মানুষরাই। প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার সন্দীপ মুন্সি হয়েছেন সম্পাদক, আহ্বায়কও একজন প্রাক্তন ফুটবলার— সুমিত মুখার্জি। সংস্থার সভাপতি রোটারিয়ান রতনময় ঘোষ নিজেও একসময় বারাসত সাবডিভিশন ক্রীড়া সংস্থার অধীনে 'এ' ডিভিশনে ক্রিকেট খেলেছেন। খেলাধুলোর উন্নয়নমূলক নানা কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে ভালবাসেন। ফুটবল লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফ এল এ)-এরও সভাপতি তিনি। কিন্তু এফ এল এ থাকতে ফুটবলের উন্নতিতে এই নতুন সংস্থা গড়লেন কেন— এই প্রশ্নে রতনময়বাবুর উত্তর: এফ এল এ-র কাজকর্ম বারাসত কেন্দ্রিক। কিন্তু আমরা বাংলার ফুটবলের স্বার্থে আরও বড় একটা মঞ্চ গড়তে চাইছিলাম। আমরা গোটা উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে ধরে কিছু কর্মসূচি নিয়ে শুরু করব, তার পর অন্যান্য জেলাতেও আমাদের কাজকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হব। তাই এই সংস্থার কার্যালয় হয়েছে কলকাতায়, যাতে সকলেই সহজে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রথমেই জেলার ১ থেকে ১৬ বছরের শিশু ও কিশোরদের নিয়ে তিনটি ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিয়ে কাজ শুরু করতে চলেছে এফ এস ডি এ। বারাসত, পানিহাটি এবং বনগাঁয় হবে এই তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে ভাবা হয়েছে সাতের দশকের ময়দান-কাঁপানো মিডফিল্ডার গৌতম সরকারের কথা। গৌতম নিজেও রাজি, বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছেন আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির থেকে। এ ছাড়াও হাজির সেদিন ছিলেন সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্তন দিকপাল গোলরক্ষক সনৎ শেঠ, আক্রমণভাগের জনপ্রিয় প্রাক্তন তারকা সমরেশ চৌধুরি। এফ এস ডি এ-র সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সম্পর্কের কথাও ঘোষণা করলেন তাঁরা। এ ছাড়া এই সংস্থার সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছেন বাংলা সিনেমা ও ধারাবাহিকের এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হাজিরও ছিলেন সেদিন মঞ্চে। চিন্ময় রায়, ভাস্কর ব্যানার্জি, রজতাভ দত্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, গৌতম দে, অরিন্দম শীল, দিগন্ত বাগচিরা সবাই মিলে ঘোষণা করলেন এফ এস ডি এ-র পাশে থাকার কথা। বেশ কয়েকটি প্রাক্তন ফুটবলার বনাম চিত্রতারকা প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলবেন এঁরা নানা জায়গায়— এই সংগঠনের তহবিল পুষ্ট করার জন্য। সব মিলিয়ে বেশ আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ। সংস্থার পক্ষে বক্তব্য, বিদেশি ফুটবলার এনে নয়, বাংলার ফুটবলকে সত্যি সত্যিই বাঁচাতে হলে স্থানীয় প্রতিভাবানদের বিকাশে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এক সময় বিভিন্ন জেলার ঘরোয়া ফুটবল থেকে উঠে আসা বহু ফুটবলারই কলকাতার মাঠে জনপ্রিয় হয়েছেন। কিন্তু এখন ঠিকমতো সুযোগের অভাবে অনেকেই মাঠমুখী হতে চায় না। দুঃস্থ পরিবারের প্রতিভাবান ছেলেরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো মনের জোর পায় না। এফ এস ডি এ এদের পাশে দাঁড়াতে চায় ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের সামনে নানা সুযোগ পৌঁছে দিয়ে। বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে এভাবেই কাজ করতে চায় এই সংগঠন— জানালেন সভাপতি রতনময় ঘোষ এবং সম্পাদক সন্দীপ মুন্সি। দেখা যাক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন এঁরা কতখানি দেখাতে পারেন ফুটবলপ্রেমী বাঙালিকে।



এবারের ছবিতে সীমানার শেষ প্রান্তে মাটিতে শুয়ে বাউন্ডারি বাঁচাচ্ছেন যে ভারতীয় ফিল্ডারটি, তিনি কে?

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রিকেটারটি হলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ইনজামাম-উল-হক। উত্তর এসেছে অনেক, এবং অধিকাংশই সঠিক। তাঁদের মধ্যে লটারিতে জিতলেন:

অসিত সরেন।

গ্রাম-গোয়ালজোড়; পোঃ-পোলবা,
জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১৫৪।

প্রতিযোগীর নাম :

বয়স :

ঠিকানা :

উত্তর আসা চাই ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। ফলাফল প্রকাশিত হবে ১৫ ডিসেম্বর সংখ্যায়।

15 November 2004 Postal Regd No. (Khela) SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-245/2004 RNI No.37823/82B

